

মধ্য যুগের কথা

ডঃ প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়





গ্রন্থসম্পুট



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক ১৯৮১ সাল হইতে প্রবর্তিত **সপ্তম শ্রেণীর** ইতিহাসের
পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত বিজ্ঞপ্তি নং-টি. বি./VII/H/81/15
পর্ষদের 8.1.81. তারিখের পত্রানুসারে।

মধ্যযুগের কথা

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

(নূতন সিলেবাস অনুসারে লিখিত)

ডঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. (কলিকাতা) ; পি. এইচ. ডি.,
(কেম্ব্রিজ) ; 'প্রোফেসার', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস বিভাগ) ;
প্রাক্তন অধ্যাপক, হুগলী মহসীন কলেজ ও প্রেসিডেন্সী
কলেজ (কলিকাতা) ; ব্রিটেনের প্রাক্তন 'কমনওয়েলথ
স্কলার' ; নবম ও দশম শ্রেণীর '**ভারত কথা**'
গ্রন্থের যুগ্ম প্রণেতা।

ও

মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম. এ. (কলিকাতা) ;
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যোগমায়া দেবী কলেজ ও আশুতোষ কলেজ
(কলিকাতা)।

গ্রন্থ সম্পুট
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশক :
শিবপ্রসাদ নাগ
গ্রন্থসম্পুট
৪৪/১সি বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯
ফোন—৪৭-৬৫৩৫

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৮১
তৃতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৮৩

পরিবেশক :
নাগবুক হাউস
১০/৪সি, দেশপ্রাণ শাসমল রোড,
কলিকাতা—৩৩

মুদ্রাকর : তারকেশ্বর প্রেস ৬, শিবু বিশ্বাস লেন কলিকাতা-৬

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ ১৯৮১ সাল হইতে সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যক্রম আমূল পরিবর্তন করিয়াছেন। এই পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর জন্য 'মধ্যযুগের কথা' পুস্তকটি প্রকাশিত হইল। এই পাঠ্যক্রমের নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। পুস্তকটি যাহাদের জন্য রচিত, তাহাদের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে আমাদের শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব। যে সকল শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত 'ভারত কথা' গ্রন্থের বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন, আশা করি 'মধ্যযুগের কথা' পুস্তকটিও তাঁহাদের প্রত্যাশা পূরণ করিবে। কেহ কোন ভুলত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
ও
মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

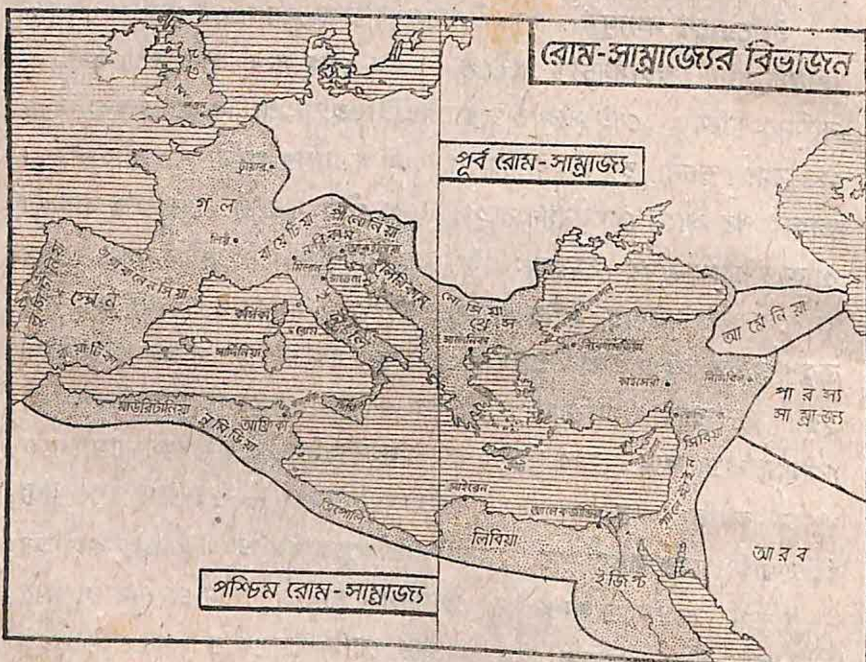
মধ্যযুগের রূপরেখা

ইউরোপে মধ্যযুগ—৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের শেষ সম্রাট বালক রমুলাস অগাস্টুলাস সিংহাসনচ্যুত হইলে পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের উপর যবনিকা নামিয়া আসে। সেই সঙ্গে ইউরোপের ইতিহাসে প্রাচীন যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূচনা হয়। ইউরোপে প্রথম সভ্যতার পত্তন করে গ্রীকজাতি। তাহার পর আসে রোমানগণ যাহারা ছিল গ্রীক সভ্যতার ধারক ও বাহক। গ্রীক ও রোমানদের সময়কাল ইউরোপের ইতিহাসে প্রাচীন যুগ। রোম আসলে ছিল টাইবার নদীর তীরে একটি ছোট নগররাষ্ট্র। এই নগর-রাষ্ট্র ক্রমশ বর্ধিত হইয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া—এই তিন মহাদেশ জুড়িয়া ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার। সুদূর রোম নগরী হইতে এই বিশাল সাম্রাজ্যকে শাসন করার অসুবিধা দেখা দিল। সেইজন্য ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় —পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্য ও পূর্ব রোম-সাম্রাজ্য। পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী রহিল পুরাতন রোম। পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল রোমান সম্রাট কন্‌স্ট্যানটাইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন শহর বাইজেন্টিনিয়াম (Byzantinium)। এখন হইতে দুই সাম্রাজ্যের জীবনধারা পৃথক খাতে বহিতে থাকে। প্রথমে পশ্চিম সাম্রাজ্যের পতন হয়—পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে। সম্রাটদের স্বেচ্ছাচারে, অর্থের প্রাচুর্য ও অপচয়ে এবং সাধারণ প্রজাদের দারিদ্র্যে ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিম সাম্রাজ্য জার্মানীর উপজাতিগুলির আঘাতে ও আক্রমণে সহজেই ভাঙিয়া পড়িল। পূর্ব রোম-সাম্রাজ্য আরো এক সহস্র বৎসর বহাল থাকে।

মধ্যযুগে ইউরোপে সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির এক নূতন বিন্যাস

সূচীপত্র

হয়। জার্মানীর **টিউটন** (Teuton) জাতি রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া স্বকীয় শক্তি ও সামর্থ্যে পশ্চিম ইউরোপে এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলে। টিউটন জাতির বিভিন্ন শাখা ছিল **গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, আঙ্গল, স্যাক্সন,** জুট প্রভৃতি। প্রথম দিকে এই টিউটনরা ছিল অনুন্নত, তাহাদের না ছিল কলা, দর্শন বা সাহিত্য। কিন্তু তাহাদের সম্পদ ছিল সততা, সাহস, বলিষ্ঠ পৌরুষ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং সভ্যতা



ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ। সভ্যতা হইতে আহরণের এই শক্তির ফলে টিউটনগণ গ্রীক-রোমান সভ্যতার মহৎ উপাদানগুলি গ্রহণ করে, যেমন গ্রীক-রোমান কলা, রোমান আইন ও খ্রীষ্টধর্ম। এই নূতন জাতিই হয় রোমান সভ্যতার ধারক এবং ইহারা পরবর্তীকালে ইউরোপে সভ্যতার দীপ জ্বালায়।

ঐতিহাসিক সেভিল (Schevill)-এর মতে, মধ্যযুগীয় সভ্যতার তিনটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হইল গীর্জা, সামন্ত প্রথা ও স্বায়ত্তশাসিত শহর। পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপ যখন বর্বর জাতি কর্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত

হয় তখন রোমান ক্যাথলিক চার্চ সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। রোমের জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল ক্রীতদাস। দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল রোমান সমাজ বিনষ্ট হইল। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে এক নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। তাহার নাম **সামন্তপ্রথা**। এই নূতন সমাজ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষি নির্ভর। এই সমাজে এক নূতন অর্থনীতির রূপায়ণ ঘটে এবং তাহার ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদয় হয়। ইহার মধ্যে অভিজাত শ্রেণী সমাজে প্রাধান্য লাভ করে ও শাসনক্ষমতাও হস্তগত করে। রোমান সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পশ্চিম ইউরোপে নূতন নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হইল। পশ্চিমে মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল বর্তমান ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম ও জার্মানী। এই সভ্যতার আঙিনা ক্রমশই প্রসারিত হয়। একাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপে নূতন শহরের অভ্যুদয় হয় এবং এই শহরগুলির মাধ্যমে ইউরোপে এক নূতন সংস্কৃতির বিকাশ হয় যাহা পরবর্তীকালের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের পথ প্রস্তুত করে। টিউটন জাতির সৃষ্ট এই নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশের কাহিনীই মধ্যযুগের ইতিহাস। পশ্চিম ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি হইতে রেনেসাঁস-পূর্ব কাল পর্যন্ত মধ্যযুগের ব্যাপ্তি।

ভারতে মধ্যযুগ—ভারতবর্ষে গুপ্তযুগের সমাপ্তির সঙ্গে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়। বর্বর হূনজাতির আক্রমণে যেমন পশ্চিম সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয় তেমনই ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয় ঐ হূনদেরই তীব্র আক্রমণে। হূনদের একটি শাখা পারস্য ও ভারতে প্রবেশ করে এবং পাঞ্জাব অধিকার করিয়া ভারতে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালায়। ফলে গুপ্তযুগের সোনার ভারত ছারখার হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের পট পরিবর্তিত হইতে থাকে পঞ্চম শতাব্দী হইতেই। তখনই সামন্ত-সম্পর্কের সূচনা হয়। গুপ্ত যুগে সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল বর্ণাশ্রম। কিন্তু জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের মধ্যে বিবাহ ও আহার একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু গুপ্ত-উত্তর যুগে রাজনৈতিক

অরাজকতা ও অনৈক্য বিভেদের ভাবকে প্রবল করিয়া তোলে। রাজপুত জাতির উত্থান এই যুগের এক প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে তুর্কীরা। রাজপুত ও মুসলমানদের সংঘাত মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসের এক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই সংঘর্ষের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার সমন্বয়ে একটি নূতন ধারা সৃষ্টি হইয়াছিল।

মধ্যযুগের অসমান গতি-প্রকৃতি—ভারত ও ইউরোপ উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ বলা হইয়া থাকে। ইতিহাসে যুগবিভাগ সহজসাধ্য নয়। জাতির জীবন একটি অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন ধারা। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে কোন যুগের সূচনা বা অবসান হয় না। এক যুগ হইতে আর এক যুগের বিকাশ ঘটে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মাঝে সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা টানা কঠিন। ইহা ব্যতীত মধ্যযুগের ক্রমবিকাশ সর্বত্র সমান নয় ও একই কালে সীমাবদ্ধ নয়। সভ্যতা বিকাশের ধারাও সব দেশে এক নয়, বরং ইহার গতি ও প্রকৃতি অসমান ও বৈচিত্র্যময়। ভারত বাইজেন্টাইন, চীন বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারায় স্বাতন্ত্র্য ছিল। তবু বলা চলে যে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ হয়। যাজক ও অভিজাত শ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে। ধর্ম রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে যুগের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় | পশ্চিমে মধ্যযুগের সূচনা

হূন অভিযান—যে সকল বর্বর জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সবচাইতে দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর ছিল হূন জাতি। এশিয়া মহাদেশের মঙ্গোলিয়া ছিল ইহাদের জন্মভূমি। হূনরা ছিল যাযাবর জাতি। খাদ্যের সন্ধানে তাহারা এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত ও মাঝে মাঝে প্রতিবেশী দেশগুলিতে হানা দিত। ইহাদের মুখ সরু, নাক চাপা, শক্ত উঁচু চোয়াল ও ছোট পা। গর্তের মত

ছোট চোখগুলি শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিত। বর্ণে ইহারা পীত, বৃত্তিতে শিকারী। ইহারা স্বভাবে হিংস্র, কিন্তু শ্রমশক্তিতে অক্লান্ত। ইহাদের আহার্য ছিল কাঁচা মাংস। বলিতে গেলে অশ্বপৃষ্ঠেই ইহারা জীবন কাটাইত। অনেক সময় সেইখানেই তাহারা আহার করিত ও ঘুমাইত। যে দেশ আক্রমণ করিত সে দেশের নারী ও শিশুকে তাহারা পিশাচের ন্যায় হত্যা করিত। তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর ধনুক। চতুর্থ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় খাদ্যাভাব হূনদের পূর্ব ও পশ্চিমে ঠেলিয়া দেয়। একদল ভারতে প্রবেশ করে। বাকি সকলে ইউরোপে অভিযান করে। কাস্পিয়ান সাগর ও উরাল পর্বতমালার মধ্য দিয়া ইহারা ইউরোপের দ্বারে আসিয়া পৌঁছায় এবং পর্বতশিখর হইতে বহমান বন্যাতরঙ্গের মত ইউরোপ মহাদেশের বুকে আছড়াইয়া পড়িয়া জার্মান জাতিগুলির মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। সেই দুর্বার অভিযানকে প্রতিহত করবার শক্তি কাহারো ছিল না।

রোম আক্রমণ—ভল্গা নদী অতিক্রম করিয়া হূনগণ প্রথমে গথ্‌দের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হূনদের চাপে পড়িয়া ভিসিগথেরা রোমের ঘাড়ে গিয়া পড়ে। বিলাসে ও ব্যাভিচারে পঙ্গু রোমানরা এই চাপ সহ্য করিতে পারিল না। শুরু হইল রোমের বিনাশের পালা। ভিসিগথদের রাজা এলারিক (Alaric) আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া ইটালীতে হানা দিলেন। বিখ্যাত কার্থেজ-বীর হ্যানিবলের অভিযানের পর এমন বিপদের সম্মুখে রোমানরা আর পড়ে নাই। এলারিক রোম লুণ্ঠন করেন ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে। যে নগরী একদিন পৃথিবীকে শাসন করিত সেই রোম এখন অত্যাচারের অসহায় বলি হইয়া রহিল।


গথদের যুদ্ধের অস্ত্র

অতঃপর আসিলেন আফ্রিকার কার্থেজ হইতে বিখ্যাত ভ্যাণ্ডাল সর্দার গাইসারিক (Gaiseric)। আকৃতিতে খর্ব ও খঞ্জ কিন্তু প্রকৃতিতে অতি নির্দয় ছিলেন এই ভ্যাণ্ডাল নেতা। তিনি ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দুই সপ্তাহ ধরিয়া

রোমে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব চালান। রোম শ্মশানে পরিণত হইল। কেবলমাত্র পোপ প্রথম লিও-র অনুরোধে ভ্যাণ্ডালরা শহরের গীর্জাগুলিকে ধ্বংস করে নাই।

অ্যাটিলা-র আগমন—অতঃপর হূন-রাজ অ্যাটিলা-র (Attila) ইটালী অভিযানের পালা। এই নির্মম হূন নেতাকে বলা হইত 'ভগবানের অভিশাপ' এবং তিনি নাকি যে ভূমিতে পদসঞ্চার করিতেন সেখানে ঘাস জন্মাইত না। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাইন নদী পার হইয়া গল দেশ লুণ্ঠন করেন। কিন্তু চালোন্‌সের যুদ্ধে রোমান ও ভিসিগথদের সম্মিলিত প্রতিরোধের



বর্বর যোদ্ধা

সম্মুখে তিনি নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অ্যাটিলার এই ব্যর্থতায় পশ্চিমী সভ্যতার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা রক্ষা পাইল। পরের বৎসর (৪৫২ খ্রীঃ) অ্যাটিলা ইটালীর নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করিলেন। মহান নগরী একুইলিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হইল। মিলান ও পেভিয়া লুণ্ঠন করিয়া হূনগণ মিন্‌সিও নদীর ধারে পৌঁছিল। রোমকে বাঁচাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। এমন সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। একদিন নদীর ওপার হইতে সঙ্গীতের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে হূনগণ সবিস্ময়ে দেখিল পতকা ও ক্রশ চিহ্ন উচ্চে ধরিয়া পাদ্রীদের একটি শোভাযাত্রা নদীর ঐ তীর ধরিয়া চলিয়াছে। শোভাযাত্রার মধ্যভাগে ছিলেন এক সৌম্য শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, প্রার্থনায় মগ্ন ও উন্নত মহিমায় ভাস্বর। অ্যাটিলা তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে উত্তর আসিল—'লিও, পোপ'। অতঃপর অ্যাটিলার তাঁবুতে পোপ ও হূননেতাদের মধ্যে এক সাক্ষাৎকার হয়। পোপের প্রভাবে অ্যাটিলা রোম আক্রমণ না করিয়া সৈন্যদলকে ফিরিবার নির্দেশ দিলেন। এইভাবে রোম হূন-আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। পরের বৎসর অ্যাটিলার মৃত্যু হয়। শীঘ্রই বিশাল হূন সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

পশ্চিম সাম্রাজ্যের আয়ু শেষ হয় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হইল, কিন্তু রোমীয় সভ্যতার সুমহান ঐতিহ্য নষ্ট হইল না। বাঁচিয়া রহিল রোমান কলা, সাহিত্য এবং রোমান আইন যাহা রোমান সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ অবদান। বর্বর উপজাতিগুলি রোমের রীতি-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যের স্মৃতি বহন করিয়া রহিল রোমান চার্চ। এমন কি বিশ্বের ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলার প্রতীকরূপে রোমান সাম্রাজ্যের ছবি মানুষের ভাবমানসে জাগিয়া রহিল। এমন ধারণা বিস্তার লাভ করিল যে রোমান সাম্রাজ্য মৃত নয়, তাহাকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন সাম্রাজ্যও থাকিবে। পশ্চিমের দেশগুলিতে চার্চগুলির ঐক্য রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণাকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ইহাই উত্তরকালে সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের সহায়ক হয়।

জার্মানদের জীবনধারা—জার্মানীর যে উপজাতিগুলি পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিল তাহারা ছিল দেহে মনে শক্তিশালী। তাহাদের ছিল দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সোনালী চুল, নীল চোখ। শস্য ও পশুচারণ ভূমির মধ্যে ছিল তাহাদের পল্লী। সেখানে তাহারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করিত। তাহাদের কুটীরগুলি ঝোপ ও কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত। অপেক্ষাকৃত ধনীদের বড় বাড়ীগুলি পরিখা বা দেওয়ালের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। মুক্ত জীবনের প্রতি ছিল টিউটনদের অনুরাগ। তাই তাহারা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিত না। গ্রামগুলি ঘন বসতিপূর্ণ ছিল না। ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস বলিয়াছেন, টিউটনরা দূরে দূরে এলোমেলোভাবে বাস করিত। প্রাচীর ঘেরা রোমান শহরগুলিকে তাহারা কারাগারের ন্যায় মনে করিত।

জার্মানরা ছিল শিকারী, তাহাদের প্রধান পেশা ছিল শিকার ও পশু-পালন। যুদ্ধে তাহারা খুব পটু। নিয়মানুবর্তিতা বা সেনাপতির প্রতি আনুগত্যের অভাব তাহাদের মধ্যে ছিল না। তাহাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল তীরধনুক। ব্যবসা-বাণিজ্য বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল না। লুণ্ঠন ও যুদ্ধে অভ্যস্ত হওয়ায় কৃষিকার্যের প্রতি ছিল তাহাদের অনীহা। সেই

সময় তাহাদের কৃষি জীবনের সূচনা মাত্র হইয়াছিল। জার্মানরা গৃহপালিত পশু যেমন গরু, ঘোড়া, মেষ, কুকুর পালন করিত। জার্মান সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল না। জার্মান নারীর কাজ ছিল স্বামীর সুখদুঃখের অংশীদার হওয়া ও সন্তান পালন করা। আয়া বা ভৃত্যদের হাতে শিশুদের ছাড়া হইত না। পরিবারে পুরুষের শাসন কঠোর ছিল।

জার্মান সমাজব্যবস্থার সহিত প্রাচীন আর্যদের সমাজের সাদৃশ্য ছিল। প্রত্যেক জাতি কয়েকটি উপজাতিতে ও প্রত্যেক উপজাতি কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। সমগোত্রীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব টিউটনদের প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্য। কোন গোষ্ঠীর কাহাকে হত্যা করা হইলে হত্যাকারী যে গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হইত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ, শত্রুতা ও প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি মধ্যযুগে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের পথে বার বার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনেকগুলি পল্লী লইয়া গঠিত হইত 'হানড্রেড'। হানড্রেডগুলির সমবায়ে গঠিত ছিল ক্যান্টন। সব ক্যান্টনের সমষ্টি উপজাতির রাজ্য বা রাইক (Reich)। গ্রামের শাসনভার ছিল সর্দারদের হাতে। শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা। রাজাকে শাসন কার্যে সহায়তা করিত দুইটি পরিষদ। একটি লর্ড বা অভিজাত ব্যক্তিদের সংস্থা। সমাজে অভিজাত শ্রেণী ছিল জন্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্থা পরবর্তীকালে রোমান রীতিনীতির সংমিশ্রণে সামন্ততন্ত্রের পথ সুগম করে। অপর পরিষদটি ছিল স্বাধীন নাগরিকদের সভা। ইহার প্রধান কাজ ছিল বিতর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সুতরাং এই সভা বিবাদের মীমাংসা করিত এবং আঞ্চলিক বিচারলয় রূপে মধ্যযুগে ইহার এক গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা ছিল।

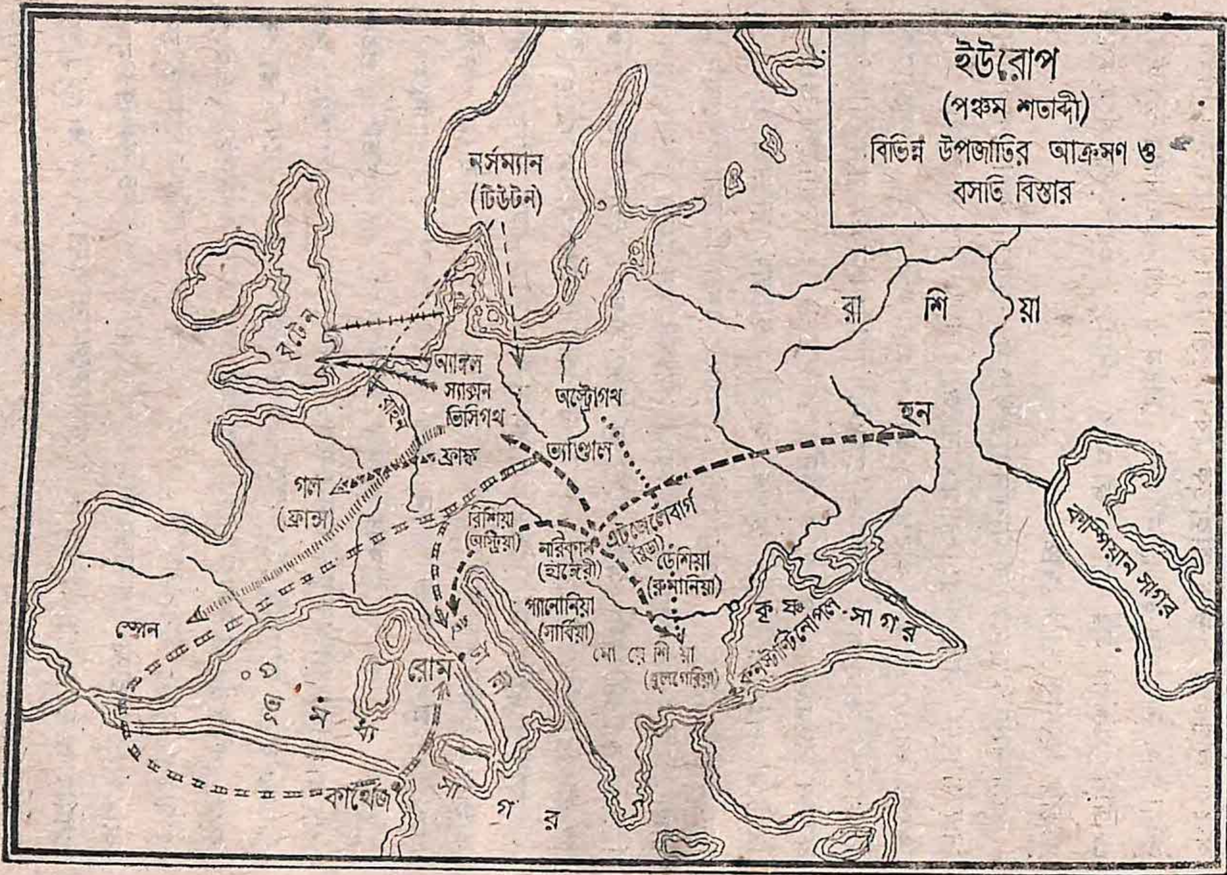
জার্মানরা নানা দেবদেবীর উপাসনা করিত। টুই, ওডিন, থর প্রভৃতি তাহাদের অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়। ধর্মের বৈচিত্র্য অনেক ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি করিত।

এই জার্মান উপজাতিগুলি কেন রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল? ইহার প্রধান কারণ তাহাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, খাদ্যাভাব

ও জলা-জঙ্গলে ঢাকা চাষের অনুপযোগী জমি। ইহার সহিত বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অরণ্যে অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদ তো ছিলই। রোমের ঐশ্বর্য ও উর্বরা জমি তাহাদের হাতছানি দিত। রাইন ও ড্যানিয়ুব নদীর উপত্যকার রোমান প্রদেশগুলির শান্ত জীবন ও সোনার ফসলে ভরা শস্যক্ষেত্রকে তাহারা হিংসার চোখে দেখিত।

রোমান সাম্রাজ্যে জার্মান বসতি স্থাপন—উপরোক্ত কারণে জার্মানরা নিজ বাসভূমি ত্যাগ করিয়া রোম সাম্রাজ্যে হানা দিল ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করিল। ভ্যাণ্ডালরা আফ্রিকাতে, অস্ট্রোগথরা ইটালীতে, ভিসিগথরা গল ও স্পেনে, বার্গাণ্ডিয়ানরা রোন উপত্যকায়, ফ্রাঙ্করা বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কতকাংশে এবং অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ব্রিটেনে তাহাদের বসতি স্থাপন করে। ভ্যাণ্ডাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গাইসারিক। অস্ট্রোগথদের বিখ্যাত রাজা ছিলেন থিওডোরিক। রাজা ইউরিক ভিসিগথদের শক্তিবৃদ্ধি করেন। ফ্রাঙ্কদের বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন ক্লোভিস, চার্লস, মর্টেল, পেপিন ও শার্লিমেন। ইহারা যুদ্ধ ও রাজ্য-জয়ের দ্বারা পশ্চিম ইউরোপে এক বিশাল ফ্রাঙ্কীয় রাজ্য গড়িয়া তোলেন।

জার্মানদের রোম জয়ের ফলাফল—জার্মানীর বিজয়ী উপজাতিগুলি তাহাদের প্রাচীন বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দূর রোমান সাম্রাজ্যে ল্যাটিন জনগণের মধ্যে বসতি স্থাপন করে। স্বদেশের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক চিরতরে লুপ্ত হয়। সংখ্যায় বৃহত্তর রোমানদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাহারা জাতীয় অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে ও ক্রমশঃ রোমান জাতির সহিত মিশিয়া যায়। ফ্রাঙ্করাই কেবল স্বদেশ ও স্বজাতিদের সহিত সংযোগ রাখিয়া স্বকীয় শৌর্য ও কৃষ্টি বজায় রাখে। পতনোন্মুখ রোমান জাতির ধমনীতে জার্মানরা নূতন রক্ত সঞ্চালিত করে। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত এবং সংমিশ্রণের মারফত এক নূতন সভ্যতার উদয় হয়। ভূমিভিত্তিক এক নূতন জার্মান অভিজাত শ্রেণীর জন্ম হয়। গ্রামাঞ্চলে রোমানরা সার্ফ বা ভূমিদাসে পরিণত হয়। জার্মান উপজাতীয় রাজাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়। বর্বর জাতিগুলি একে একে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে ও ইহার প্রভাবে পরিশুদ্ধ হইয়া উন্নত জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হয়।


ইউরোপ
(পঞ্চম শতাব্দী)
বিভিন্ন উপজাতির আক্রমণ ও
বসতি বিস্তার
নর্সম্যান
(টিউটন)
রা শি য়া
হুন
অস্ট্রোগথ
অ্যাঙ্গল
স্যাক্সন
ভিসিগথ
ভ্যাণ্ডাল
ফ্রাঙ্ক
গল
(ফ্রান্স)
স্পেন
রোম
কার্থেজ
ডেশিয়া
(রুমানিয়া)
প্যানোনিয়া
(সার্বিয়া)
সাগর
কাস্পিয়ান সাগর

তৃতীয় অধ্যায় | ইউরোপে 'অন্ধকার যুগ'

৪০০ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে এই অধ্যায়কে ঐতিহাসিকরা অন্ধকার যুগ আখ্যা দিয়াছেন। পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে পঞ্চম শতাব্দীতে এবং এই সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুই-এর অন্তর্বর্তী কালটি অন্ধকার বা বর্বর যুগ (Dark Ages) নামে অভিহিত। এই নামকরণের পশ্চাতে বাস্তবভিত্তি নিশ্চয় আছে। এই সময়েই একদা ধনবল ও জনবলে সমৃদ্ধ গর্বোদ্ধত রোমান সাম্রাজ্য ধ্বসিয়া পড়িল। অযোগ্য শাসনে ও শোষণে, বিলাসে ও অপচয়ে এই সাম্রাজ্যের সর্বাঙ্গে ঘুণ ধরিয়াছিল। ইহার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। ছিল না কোন প্রতিরোধের ক্ষমতা। তাই বর্বর জাতিগুলির ক্রমাগত আঘাতে এই বিশাল সাম্রাজ্যের কাঠামো তাসের বাড়ির মতই ভাঙিয়া পড়িল। পশ্চিম ইউরোপে শুরু হইল ধ্বংসের যুগ। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙিয়া পড়িল। প্রশাসনিক যন্ত্র বিকল হইয়া গেল। সেনাদল অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। গোলোযোগের সুযোগ লইয়া তাহারা ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ করিল। বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় চারিদিক ছাইয়া গেল।

বর্বর জাতিগুলি শ্রেষ্ঠ রোমান শহরগুলিকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিল। লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ জনপদকে শ্মশানে পরিণত করিল। ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ হইতে শুরু করিয়া শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিও তাহাদের নিষ্ঠুর লালসার হাত হইতে রক্ষা পাইল না। অনেক শহরের অধিবাসীরা প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। কেহ কেহ সশস্ত্র হানাদারদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনও বিপর্যস্ত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকায় পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হইয়া পড়ে। ক্রীতদাস ব্যবসাও ব্যাহত হয়। জাহাজে বা স্থলপথে খাদ্যশস্য চলাচল রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কৃষিকাজ অবহেলিত

হয়। সীমান্ত প্রদেশগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। অনেকে শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

ইউরোপের সাংস্কৃতিক জগতও এই সময় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্বর জাতিগুলি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ছিল অনুন্নত। তাহাদের নিজস্ব কোন কৃষ্টি ছিল না। গ্রীক-রোমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাহারা প্রথম-দিকে ছিল উদাসীন। সুতরাং গ্রীক রোমান সভ্যতার অনবদ্য অবদানগুলি লুণ্ঠিত গ্রাম ও শহরের আবর্জনার তলায় চাপা পড়িয়া রহিল। গ্রীক মনীষী ও দার্শনিকদের অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলি অবহেলিত হইয়া গীর্জা ও মঠের গ্রন্থাগারের মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া রহিল। এই যুগে কোন সিসেরো, ভার্জিল বা টমাস এ্যাকুইনাসের মত বিরাট সাহিত্যিক-মনীষীর আবির্ভাব হয় নাই। শিখরাসীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই সময় দেখা যায় না। এই সকল দিক হইতে বিচার করিলে এই যুগকে 'অন্ধকার যুগ' বলা অসঙ্গত হইবে না।

কিন্তু কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে না দেখিয়া যদি সামগ্রিকভাবে এই শতাব্দীগুলির গভীরে ডুব দেওয়া যায় তাহলে স্পষ্টই দেখা যায় যে এই যুগেই ইউরোপকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলে। সেই প্রচেষ্টার পিছনে ছিল মানুষের চিরন্তন জীবনীশক্তি যাহা সৃষ্টি করে, গঠন করে। এই যুগ সৃজনশীল কর্মের যুগ, প্রস্তুতির যুগ, সমন্বয়ের যুগ। তাই যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার মধ্য হইতে একটি সত্যকার সভ্যতার সূচনা হয়। রোমান রাষ্ট্রের পতন হইলেও প্রাচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বিনাস হয় নি। তাহার কারণ ঐ ঐতিহ্যর গতিশীলতা। এই যুগে ল্যাটিন ভাষা প্রসার লাভ করে। ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যের সহিত খ্রীষ্টীয় আদর্শের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয় ও তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বোয়েথিয়াস, পলিনাস, প্রুডেনসিয়াস প্রমুখ খ্রীষ্টান লেখকগণ। শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে চার্চ। পোপ, পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরা এক নূতন সংস্কৃতির বুনিয়াদ তৈয়ারী করেন। এই যুগে চার্চের নেতৃত্বে রোমান ও জার্মান ধারার সমন্বয় হইয়া এক নূতন খ্রীষ্টীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই যুগে জ্ঞানচর্চা বন্ধ হইয়া যায় নাই। বর্বর জাতির আক্রমণে যখন পশ্চিম ইউরোপে ভাঙন ও অরাজকতার বন্যা নামিল তখন ভরাডুবির হাত হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিতে ব্রতী হইলেন শিক্ষিত যাজক সম্প্রদায়। সভ্যতা সংস্কৃতিকে রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এই যুগ সাধুসন্তদের যুগ। আতঙ্ক, হতাশা, দুঃখ, দুর্দশা ও ধ্বংসের মাঝে আশার বাণী ও মহান আদর্শ বহন করিয়া আনিলেন সেণ্ট জেরোম সেণ্ট অ্যাম্‌ব্রোস, সেণ্ট বেনেডিক্ট, সেণ্ট গ্রেগরী, সেণ্ট অগাস্টাইন প্রমুখ খ্রীষ্টান সন্তগণ। এই সকল 'ল্যাটিন পিতা' অন্ধকার যুগে জ্ঞানের মশাল জ্বালাইয়া যুগকে আলোকিত করেন ও বর্বরতা হইতে উত্তোলিত করেন। এই সন্তদের অবদানে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ও ইহার নৈতিক আদর্শ যুগের মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়। গীর্জা ও মঠগুলি ছিল সে যুগে বিদ্যা চর্চার কেন্দ্রস্থল। তাহারা শিক্ষাসংস্কৃতির দ্বীপ জ্বালাইয়া রাখে। সে যুগের খ্রীষ্টান সন্তরা ছিলেন সুমহান লেখক। লেখনীর মাধ্যমে তাঁহারা খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন করেন। সেণ্ট অগাস্টাইন তাঁহার বিখ্যাত বই 'সিটি অফ গড' লেখেন ভ্যাণ্ডালগণ কর্তৃক রোম লুণ্ঠনের পর। এই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন, রোমান জগতের কলুষের জন্য খ্রীষ্টধর্ম দায়ী নয়। সেণ্ট গ্রেগরী স্বহস্তে বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অগাস্টাইনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেণ্ট বেনেডিক্ট মণ্টে ক্যাসিনোতে তাঁহার বিখ্যাত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশৃঙ্খলা ও বাস্তুত্যাগের যুগে এই মঠ ছিল শান্তির আশ্রয়-স্থল। বেনেডিক্টের আদর্শ ছিল নৈতিক ও সামাজিক। সন্ন্যাস-জীবনের অতি কঠোরতা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই সন্ন্যাসীর ধর্ম। সততা, আনুগত্য, দৈহিক শ্রম ও কর্তব্য পালনই ছিল তাঁহার নীতি।

এইভাবে এই যুগে ধর্মীয় চেতনা মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধকে জাগ্রত করে এবং নৈতিক আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখে। সেই দিক হইতে এই যুগ অন্ধকার নয়।

কন্‌স্টাণ্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা—খ্রীষ্টীয় ৩৩০ সালে রোমান সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন বাইজেন্টিয়াম নামক স্থানে 'নোভা রোমা' নামে তাঁহার নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহর ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে বস্‌ফরাস প্রণালীর মুখে অবস্থিত। প্রচুর অর্থব্যয়ে এই আনিন্দ্য শহর নির্মিত হইল। কন্‌স্টান্‌টাইনের নাম অনুসারে ইহার নাম হইল কন্‌স্টান্টিনোপল। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হইলে কন্‌স্টান্টিনোপল হইল পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী। বর্বর জাতির আক্রমণের ঝাপটা এই নগরকেও সহ্য করিতে হইয়াছে। হূননেতা অ্যাটিলা একবার কন্‌স্টান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।



কন্‌স্টান্‌টাইন

গথ, বুলগেরিয়ান ও স্লাভরা ইহার উপর হানা দিয়াছিল। কিন্তু তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত ও পশ্চিমদিকে তিন সারি দুর্গের দ্বারা ঘেরা এই শহর ছিল দুর্ভেদ্য। তাই দশ শতাব্দী ধরিয়া বহু আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া কন্‌স্টান্টিনোপল তাহার নিজ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। ম্যাসিডন, বল্কান, উপদ্বীপ, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর প্রভৃতি লইয়া গঠিত ছিল বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের আক্রমণে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়।

রোমান সম্রাটদের মধ্যে কন্‌স্টান্‌টাইন প্রথম খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকৃতি দান করেন। খ্রীষ্টধর্ম একেশ্বরবাদী। রোমানরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তাই খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের পর রোমান সম্রাটগণ এই ধর্মের লোকেদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। খ্রীষ্টানদের আগুনে পোড়াইয়া ও সিংহের মুখে ঠেলিয়া দিয়া হত্যা করা হইত। কিন্তু এই নির্যাতন এবং খ্রীষ্টানদের সাহস ও সহনশীলতা খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক বল বৃদ্ধি করে।

শহীদের রক্তে গীর্জার ভিত্তি রচিত হয়। কন্‌স্টান্‌টাইন এই নবীন ধর্মের প্রাণশক্তি ও সংহতির মহিমাকে উপলব্ধি করেন। খ্রীষ্টধর্ম বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়।

জাস্টিনিয়ান—এই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এক সুমহান সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান (Justinian)। তিনি ৫২৭ হইতে ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম সুবর্ণ যুগ। জাস্টিনিয়ান একাধারে ছিলেন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, সুদক্ষ শাসক ও সুপণ্ডিত। ল্যাটিনশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। জাস্টিনিয়ানের সিংহাসনে আরোহণের সময় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য অর্থে ও সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছিল। জাস্টিনিয়ান রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে এক উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। রোমান ঐতিহ্যে বিশ্বাসী এই সম্রাট খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে একক রোমান রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি ভ্যাণ্ডাল, ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ প্রভৃতি বর্বর জাতিদের ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। জার্মান রাজাদের প্রতি তাঁহার ছিল তীব্র ঘৃণা। তিনি মনে করিতেন রোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ফলেই পশ্চিমের জার্মান রাজ্যগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। গোঁড়া খ্রীষ্টান রূপে গথ ও ভ্যাণ্ডালদের এরিয়ান ধর্মের প্রতি ছিল তাঁহার বিতৃষ্ণা। তাঁহার লক্ষ্য ছিল উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ইটালী জয় করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমকে ঐক্যবদ্ধ করা।



জাষ্টিনিয়ান

যুদ্ধের পর অস্ট্রোগথিক শক্তি চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করিল। আল্পস্ অঞ্চলে এই জাতি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। র‍্যাভেনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইতালীতে বাইজেণ্টাইন শাসন প্রবর্তিত হইল (৫৫২ খ্রীঃ)।

জাস্টিনিয়ান পারস্য দেশের সহিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হন। কেবল রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারই নয়, পূর্বজগতের বাণিজ্য অধিকারের প্রয়াসও ছিল এই যুদ্ধের কারণ। ইহার সহিত ছিল ধর্মীয় পার্থক্য ও তিক্ততা। কিন্তু জাস্টিনিয়ানের পারস্য নীতি দুর্বল ছিল। পশ্চিম বিজয়ের স্বপ্ন সার্থক করিতে গিয়া তিনি পূর্ব সাম্রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেন। ডেরার যুদ্ধে পার্শিয়ানরা পরাজিত হইলেও জাস্টিনিয়ান ভ্যাণ্ডালদের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজনে পারস্যের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। পার্শিয়ানরা ইহার সুযোগ লইয়া আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে, ফলে শান্তি বারবার বিঘ্নিত হয়। ইটালীতে প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য জাস্টিনিয়ান পার্শিয়ানদের তোষণ করিতে বাধ্য হন। তবে কৃষ্ণ সাগর ও পূর্বের বাণিজ্যপথে তিনি তাঁহার অধিকার বজায় রাখিতে সক্ষম হন।

এইভাবে জাস্টিনিয়ান পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিত করিয়া ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াসী হন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তগুলি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা তিনি বাস্তবায়িত করিতে পারেন নাই। স্পেনে ভিসিগথদের রাজ্য ও ফ্রান্স-জার্মানিতে ফ্রাঙ্কদের রাজ্য তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের সাধ মাত্র আংশিকভাবেই সফল হয়। এক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভাবান সেনাপতি বেলিসারিয়াসের অবদান অনস্বীকার্য।

জাস্টিনিয়ানের আইনবিধি—শুধুমাত্র বিজয়ী বীররূপেই জাস্টিনিয়ানের নাম ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হইয়া নাই, রোমক সভ্যতার মহত্তম দান তাহার আইন পদ্ধতির রক্ষকরূপেই জাস্টিনিয়ান চিরস্মরণীয়। রোমান আইনের সংকলনই হইল তাঁহার চিরস্থায়ী কীর্তি। জাস্টিনিয়ান উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সুবিন্যস্ত আইন ছাড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব। রোমান সাম্রাজ্যের শেষদিকের ও তাঁহার পরবর্তীকালের অরাজকতায় রোমান আইনজ্ঞদের মূল্যবান কীর্তি বিনষ্ট হইবার বিপজ্জনক

ঐ সকল দেশের রোমান জনগণের আনুগত্যের প্রতি তিনি আস্থাশীল ছিলেন। নিজের সামরিক শক্তিতে পূর্ণ আস্থা লইয়া তাঁহার নব বলে বলীয়ান সাম্রাজ্যের শক্তি তিনি প্রয়োগ করিলেন পররাজ্য অপহারক বর্বর জার্মান রাজগণের উচ্ছেদ সাধনে ও পশ্চিম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে।

জাস্টিনিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তার—প্রথমে জাস্টিনিয়ান আফ্রিকাতে ভ্যাণ্ডালদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রতীরে অবতরণ করিলেন। তুর্বল ভ্যাণ্ডাল রাজ্য তখন ক্ষয়ের পথে। ভ্যাণ্ডাল



সেনাবাহিনীর এক অংশ তখন সার্ডিনিয়াতে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। জাস্টি-নিয়ানের বিখ্যাত সেনাপতি **বেলিসারিয়াস** সসৈন্যে কার্থেজে প্রবেশ করেন এবং তুইটি যুদ্ধে ভ্যাণ্ডাল রাজাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। মরক্কো বাইজেণ্টাইনের অধীনে আসিল।

সিসিলি, সার্ডিনিয়া, কর্সিকা ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ ভ্যাণ্ডালদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। ভ্যাণ্ডাল বিজয় শেষ হইবার পূর্বেই সিসিলি হইতে বেলিসারিয়াস ইটালী আক্রমণ করিলেন। ইটালীতে অস্ট্রোগথরা রাজত্ব করিতেছিল। আফ্রিকার ন্যায় সেখানেও রোমান জনগণ বর্বর প্রভুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিল। নেপল্‌স্‌, রোম ও র‍্যাভেনা বেলসারিয়াসের সৈন্যদলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ

সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। রোমান আইনসমূহ তখন বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। জাস্টিনিয়ানের পূর্বে সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস রোমান আইনকে একটি সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়। শাসক হিসাবে জাস্টিনিয়ানের প্রথম কর্তব্য হইল বিক্ষিপ্ত আইনগুলিকে সংহতি দান ও আধুনিক কালের উপযোগী করা। এই উদ্দেশ্যে জাস্টিনিয়ান তাঁহার মন্ত্রী ট্রিবনিয়ানের নেতৃত্বে এক আইন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন পূর্বেকার ভাষ্যকে ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্রাট হ্যাড্রিয়ান হইতে জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল পর্যন্ত সকল বিধিবদ্ধ আইনকে একই গ্রন্থে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে। ইহাই জাস্টিনিয়ানের আইনবিধি (Justinian Code) নামে সুপরিচিত।

জাস্টিনিয়ানকৃত এই আইন মানুষের সভ্যতার চিরকালীন সম্পদ। এই প্রামাণ্য গ্রন্থ আজও ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে এই রোমান আইন আজও সমাদৃত। আইনের ছাত্রদের এই বই অবশ্যপাঠ্য। এই গ্রন্থে যেমন আইনের ক্ষেত্রে রোমানদের অবিস্মরণীয় প্রতিভার সুস্পষ্ট সাক্ষর রহিয়াছে তেমনই পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্য ও জাস্টিনিয়ানের রাজত্ব-কালের একটি বিশ্বস্ত চিত্রও এখানে পাওয়া যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, জাস্টিনিয়ানের উদ্যোগ ব্যতীত রোমান সভ্যতার এই শ্রেষ্ঠ দানটি সম্ভবতঃ হারাইয়া যাইত। সেইজন্য জাস্টিনিয়ানের আইন-সংকলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা—রণনৈপুণ্য ও আইন রচনা ছাড়াও জাস্টিনিয়ান শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি স্থাপত্য শিল্পের গভীর অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে এই শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে। নিজের রাজধানীকে সুরম্য অট্টালিকা, প্রাসাদ, স্নানাগার প্রভৃতিতে সুসজ্জিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সমগ্র সাম্রাজ্যে বিখ্যাত দুর্গ, গীর্জা, মঠ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ করেন। জাস্টিনিয়ান একজন সুদক্ষ নির্মাতা। তাঁহার রাজত্বকালের স্থাপত্যকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল **সাণ্টা সোফিয়া** গীর্জা। অজস্র অর্থ, সময় ও দশ হাজার কর্মীর অনলস পরিশ্রমের ফসল এই সুবিখ্যাত গীর্জা। ইহা নির্মাণ

করিতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ইহার স্থপতি ছিলেন দুই আয়োনীয় গ্রীক শিল্পী—আন্‌থেমিয়াস ও ইসিডোর। গ্রীক স্থাপত্য কলার ভারসাম্য ও সৌন্দর্য ইহাতে প্রতিফলিত হইলেও যে কোন গ্রীক মন্দির হইতে ইহার পার্থক্যও অনেকখানি। গ্রীক মন্দিরের সৌন্দর্য বহির্মুখী, সাণ্টা সোফিয়ার সৌন্দর্য অন্তর্মুখী। ইহার মধ্যভাগে ১৫০ ফুট উচ্চ এক বিশাল অথচ হালকা গোলাকৃতি গম্বুজ রহিয়াছে যাহা দেখিয়া ঐতিহাসিক প্রোকোপিয়াস মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহা যেন সোনার শৃঙ্খলে স্বর্গ হইতে ঝুলিতেছে। এই গীর্জার অলংকরণও অনবদ্য। ইহার দেয়ালে দেয়ালে স্বর্ণালী পটভূমিতে অজস্র ধর্মীয় কাহিনী নানা রঙের প্রস্তরখণ্ড বা মোজাইকের দ্বারা চিত্রিত। কথিত আছে এই মন্দিরে প্রথম প্রবেশ করিয়া ইহার অপরূপ সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া সম্রাট জাস্টিনিয়ান বলিয়া উঠিয়াছিলেন—ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ যে তিনি আমাকে এমন একটি কাজের যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন। সাণ্টা সোফিয়া গীর্জা জাস্টিনিয়ানের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। তিনি অনেক নূতন শহরও নির্মাণ করেন এবং শুধু বল্‌কান উপদ্বীপে তিন শতাধিক দুর্গ নির্মাণ করান।



সাণ্টা সোফিয়া

এই সময়ের শিল্পনৈপুণ্যও ছিল বিস্ময়কর। বিচিত্র বর্ণের পাথর ও কাঁচ-বসানো কারুকার্যের প্রচলন এই যুগেই হয়। ইহারই নাম মোজাইক। এই সময়ে মোজাইকের নানা দেবদেবী ও সাধুসন্তদের মূর্তি নির্মাণ করা হয়। গীর্জা, প্রাসাদের দেয়ালে ও ভিতরের ছাদে এই প্রথম কাঁচের মোজাইক ব্যবহৃত হয়। রঙিন টালিতে পারসিক অলংকরণের রীতি ও মেজেতে গ্রীক-রোমান অঙ্কন রীতিই সম্ভবতঃ বাইজেণ্টাইন কাঁচের মোজাইকের উৎস। স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পেও এই সাম্রাজ্যের কারিগরদের দক্ষতা ছিল অসামান্য।

জাস্টিনিয়ান অঙ্কন শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাইজেণ্টাইন অঙ্কনরীতিতে দক্ষতার অভাব ছিল না। সেই সময় একদল নিপুণ শিল্পী গুহাগর্ভে অঙ্কনে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। মাউণ্ট এথসের মঠগুলির দেয়ালে ইহার সাক্ষর রহিয়াছে। তখনকার সুন্দর পাণ্ডুলিপিগুলিতে ও মুদ্রাতে বাইজেণ্টাইন অঙ্কনরীতির মহিমা প্রতিফলিত রহিয়াছে।

জাস্টিনিয়ানের মৃত্যু হয় ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে গৌরবময়। তিনি সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন ও পূর্ব ইউরোপকে বর্বর জাতির আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করেন। তিনি কন্‌স্টাণ্টিনোপলকে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন যে সভ্যতা পরে সার্ব, বুলগেরীয় ও রুশদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে।

বাইজেণ্টিয়ামের গুরুত্ব—বাইজেণ্টিয়াম নগর এক সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যমণিই শুধু ছিল না, বহুকাল ধরিয়া ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম নগর বলিয়া গণ্য হইত। ঐশ্বর্যে, বিলাসে, শিল্পসৌন্দর্যে, আর্থিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক গুরুত্বে এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল রূপে এই শহর তখন ছিল অতুলনীয়। ভৌগোলিক দিক দিয়া কন্‌স্টাণ্টিনোপল ছিল সুরক্ষিত। সম্রাট এনাসটেসিয়াস প্রায় চুয়ান্ন মাইল দীর্ঘ এক প্রাচীর নির্মাণ করেন। কৃষ্ণসাগর হইতে প্রপন্‌টিস প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রাচীর কালের বাধা লঙ্ঘন করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। দশম শতাব্দীতে যখন বাইজেণ্টাইন সভ্যতা গৌরবের শিখরে তখন এই নগরের জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। এই নগর ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য-সেতু। পৃথিবীর বহু দেশের বাণিজ্য-তরী ইহার বন্দরে নোঙর ফেলিত। এই দেশের বণিকগণ মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। ভারত, চীন ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলি বাইজেণ্টিয়ামের মাধ্যমে ইউরোপের সহিত বাণিজ্য চালাইত। এই নগরের সঙ্গে পাল্লা দিবার ক্ষমতা তখন পশ্চিমের কোন শহরের ছিল না। যতদিন এই শহর অক্ষত ছিল ততদিন বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যও অটুট ছিল।

বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গমস্থল। দুইটি সংস্কৃতির ধারা এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বাইজেণ্টাইন

সাম্রাজ্য গ্রীক সভ্যতার ধারক ও বাহক। অন্যদিকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর ও পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলির সংস্কৃতির প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে। তাহার সহিত ছিল রোমানদের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রভাব। এই ত্রিধারার সম্মেলন বাইজেন্টাইন সভ্যতায় মূর্ত।

বাইজেন্টাইন সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক যেখানে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা রোমের পতনের পর গ্রামীণ রূপ ধারণ করে। বাইজেন্টাইন সভ্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাহার খ্রীষ্টধর্ম। এই গ্রীক খ্রীষ্টধর্মের সহিত পশ্চিমের ল্যাটিন খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বগত দিক হইতে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু বাইজেন্টিয়ামে গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির তেমন কোন সংঘাত দেখা দেয় নাই। রোমের পতনের পর গ্রীক সভ্যতার অমূল্য সম্পদ—তাহার কাব্য, সাহিত্য, দর্শন-কে বাইজেন্টিয়াম সুদীর্ঘকাল সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। এখানে গভীরভাবে গ্রীক সাহিত্যের চর্চা হইত। মূল্যবান গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলির অনুলিখন হইত। তাহা না হইলে এই সব পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়া যাইত। গ্রীক সংস্কৃতির রক্ষক বাইজেন্টাইনের কাছে পশ্চিম তাই চিরঋণী।

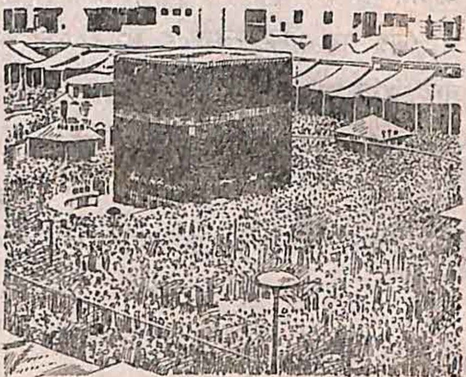
পঞ্চম অধ্যায় / ইসলাম ধর্ম ও মধ্যযুগীয় সভ্যতা

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে, আরব দেশের মরুভূমিতে পৃথিবীর একটি নূতন ধর্মের সূচনা হইয়াছিল। ইহার নাম ইস্‌লাম ধর্ম। হজরত মহম্মদ এই ধর্মটির প্রবর্তন করেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের জন্মস্থান প্যালেস্টাইন হইতে আরব দেশ খুব বেশী দূরে নয়। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই দেশ জয় করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমান সম্রাটগণ এই দেশ জয় করিয়া মুসলমান আগমনের পূর্ব পর্যন্ত শাসন করেন।

আরব দেশ ও জনগণ—আরব দেশের অধিকাংশই বালুময় মরুভূমি, ইহার আশে পাশে আছে কয়েকটি মরুদ্যান। এইগুলিকে কেন্দ্র

করিয়া সমুদ্রের ধারে উর্বর জমিতে কয়েকটি শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহরগুলির মধ্যে লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত মক্কা ও মদিনা প্রধান।

আরব দেশে দুই রকমের লোক আছে। একদল উর্বর জায়গাগুলিতে বসবাস করে, এবং চাষ-আবাদ ও কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আর এক দল মরুভূমিতে থাকে, ইহাদের বলা হয় বেদুইন। বেদুইনগণ ভ্রাম্যমাণ, পশুপালন ও লুণ্ঠন ইহাদের জীবিকা এবং ইহারা অতি দুঃসাহসী ও স্বাধীনতাপ্রিয়। আরব দেশের লোকেরাই একদিন প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও ফিনিশীয় সভ্যতার সৃষ্টি করে। কিন্তু যাহারা আরবেই রহিয়া যায় তাহারা এত সভ্য হইতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি ছিল। তাহারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিত। তাহাদের নানারকম খারাপ প্রথা ও কুসংস্কার ছিল। তাহারা অসংখ্য দেব দেবী ও গাছ পাথরের পূজা করিত। মক্কার কাবা শরিফ্ ছিল প্রধান ধর্মকেন্দ্র। এখানে একটি কৃষ্ণবর্ণের পাথর আছে, আরববাসীর কাছে এই পাথরখানি অতি পবিত্র। আরব দেশবাসী খুব অতিথিপরায়ণ ছিল, কিছু কিছু লেখাপড়ার চর্চাও তাহারা করিত। অনেক সুন্দর সুন্দর গান ও সুললিত কবিতা তাহারা রচনা করে।



কাবা

হজরত মহম্মদ—মক্কার কাবা শরিফের রক্ষণাবেক্ষণ ও যাত্রীদের দেখাশুনা করিবার ভার ছিল কোরেশ বংশের লোকদের উপর। এই বংশটি ছিল অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ এই বংশে সম্ভবতঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মহম্মদের জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতা আবদুল্লার মৃত্যু হইয়াছিল, আর জন্মাইবার ছয় বৎসরের মধ্যেই

তাঁহার মা আমিনাও মারা যান। তাঁহার পিতামহ ও পিতৃব্যের আশ্রয়ে মহম্মদ মানুষ হইতে থাকেন।

ছেলে বেলায় মহম্মদ লেখাপড়া শিখার সুযোগ পান নাই। তিনি মেষ ও উষ্ট্র পালন করিতেন। একটু বয়স হইলে তিনি পিতৃব্যের সঙ্গে দূর দূর দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে যাইতেন। এই সময়ে তিনি ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্পর্শে আসেন এবং আরবদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার ছিল তাহা দূর করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি খাদিজা নাম্নী মক্কার এক ধর্মপ্রাণা, ধনী ও বর্ষীয়সী বিধবাকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি কিছুদিন মক্কাতেই ব্যবসা করেন বটে, কিন্তু গৃহকর্মে মন দিতে পারিলেন না। তিনি প্রায়ই মক্কার নিকট 'হেরা' নামক এক নির্জন গুহাতে ঈশ্বরের ধ্যান করতেন। পনেরো বৎসর যাবত ঈশ্বরের ধ্যান করিবার পর স্বর্গের দূত জীব্রায়েল তাঁহার নিকট ঈশ্বরের বাণী প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে পয়গম্বর বলিয়া সম্বোধন করেন।

এই ভাবে আরবের মরুভূমিতে ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়। ইসলাম শব্দটির অর্থ হইল শান্তি এবং ভগবানের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করা। যাহারা এই ধর্মে বিশ্বাসী তাহাদের বলা হয় মুসলমান। পত্নী খাদিজা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মহম্মদ প্রথমে নিজের ধর্মমতে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমে তাঁহার চল্লিশজন শিষ্য হইল। ইহার তিন বৎসর পর মহম্মদ সমস্ত মক্কাবাসীর নিকট তাঁহার ধর্ম প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মহম্মদই তাঁহার প্রেরিত পুরুষ।" তিনি কাবা শরিফের সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি ভাঙ্গিতে লাগিলেন। বহু-ঈশ্বরবাদী কোরেশরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর নানারকম অত্যাচার করিতে থাকে এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। তখন তিনি বাধ্য হইয়া একমাত্র অনুচর ও শিষ্য আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া মক্কার উত্তরস্থিত ক্ষুদ্র শহর মদিনায় আশ্রয় লইলেন। ঘটনাটি ঘটে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসর হইতেই মুসলমানেরা 'হিজিরা' সাল গণনা করে। আরবী ভাষায় 'হিজিরা' শব্দের অর্থ 'স্থানান্তর গমন'। এই সময় মহম্মদের বয়স বাহান্ন বৎসর। মদিনাবাসীরা তাঁহাকে শহরের শাসনকর্তা ও সেনাধ্যক্ষ

নিযুক্ত করিল এবং সানন্দে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল। ইসলাম ধর্মের প্রভাব মহম্মদের মদিনা যাইবার পরই আরম্ভ হয়। মদিনাতে মহম্মদের প্রভাব দেখিয়া মক্কাবাসীরা ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে। অবশেষে ধর্ম যুদ্ধে ('জিহাদে') পরাস্ত হইয়া তাহারা মহম্মদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল (৬৩০)। অতঃপর সমগ্র আরব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। তেষট্টি বৎসর বয়সে মদিনাতে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

মহম্মদের উপদেশ—মহম্মদের ধর্ম মতের মূল মন্ত্র ছিল ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ধর্মের আর একটি বড় কথা হইল, সকল মানুষই ভগবানের বা আল্লার সন্তান। কাজেই তাহাদের মধ্যে ছোট-বড় বা ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ দুর্ধর্ষ ও অর্ধ-সভ্য আরব জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিল। মুসলমানেরা মহম্মদের পূর্বে আবির্ভূত অনেক মহাপুরুষকে ঈশ্বরের দূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে মহম্মদই হইলেন ঈশ্বরের শেষদূত বা পয়গম্বর। মহম্মদের উপদেশগুলি একত্র করিয়া কোরান নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন যে, মহম্মদ স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট এই উপদেশগুলি পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই গ্রন্থ খানিকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করেন। কোরানে মুসলমানদের জন্য পাঁচটি অবশ্য পালনীয় বিধির উল্লেখ আছে। প্রথম, আপন ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ্যে পুনরাবৃত্তি করা (**শাহদা**)। দ্বিতীয়, দিনে পাঁচবার মক্কার দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করা (**সালাত্**)। তৃতীয়, রমজান মাসে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করা (**রোজা**)। চতুর্থ, দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া (**জাকত্**)। পঞ্চম, মক্কায় তীর্থযাত্রা (**হজ্**)।

খলিফা ও সাম্রাজ্য বিস্তার—ইসলাম ধর্ম প্রচারের ফলে আরব সমাজের অনেকে দুর্নীতি দূর হয়, তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং সকলের মধ্যে এক নূতন ধর্মভাব জাগিয়া উঠে। এই পবিত্র ধর্ম তাহারা সমস্ত জগৎবাসীর মধ্যে প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা প্রথমে গ্রীকদের পরাজিত করিয়া **সিরিয়া** (৬৩৪-৬) ও **মিশর** (৬৩৪-৯) এবং অতঃপর সমগ্র **পারস্য** রাজ্য জয় করে (৬৪২)। ওম্মায়েদ বংশের

শাসনকালে **উত্তর আফ্রিকা** বিজিত হয়। জিব্রাল্টার প্রণালী পার হইয়া তাহারা **স্পেন** দেশও অধিকার করিল (৭১১)। পূর্বদিকে **চীন** সাম্রাজ্যের **সীমান্ত** ও সিন্ধু নদ পর্যন্ত তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। আরবেরা কন্‌স্টান্টিনোপল্‌ ও ফ্রান্স দেশ জয়ে ব্যর্থ হয় (৭১৮,৭৩২)। তথাপি মহম্মদের মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত এক বিশাল আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। ঝটিকাবেগে এই



সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। আরবদেশ ভারতের ন্যায় আয়তনে বৃহৎ হইলেও উহার জনসংখ্যা ৪০-৫০ লক্ষের অধিক ছিল না এবং পরস্পর যুদ্ধরত বালাদী ও বেদুইন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের মহাবাণী ইহাদের এক মহাজাতিতে ঐক্যবদ্ধ করিল। অপরদিকে তাহাদের বিরোধীপক্ষ শত্রুভাবাপন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় এবং দূরবর্তী ও সর্বনাশা কর-আরোপকারী কন্‌স্টান্টিনোপলের প্রতি বিরূপ থাকায় বিরাট প্রতিরোধ গড়িতে অক্ষম হয়।

এই সময় যাঁহারা মুসলমানদের ধর্মগুরু ছিলেন তাঁহাদের বলা হইত খলিফা। খলিফা শব্দের অর্থ পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী। আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী—মহম্মদের এই চারজন প্রিয় শিষ্য পরপর খলিফা (৬৩২-৬১) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন মহৎ ও ধর্মনিষ্ঠ। তাঁহারা সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন বলিয়া ইসলামের

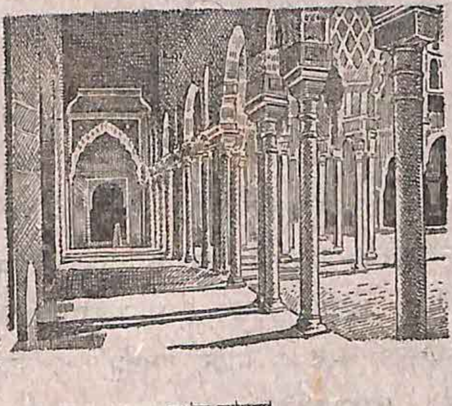
ইতিহাসে সাধু খলিফা বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের শাসনকাল শেষ হইলে খলিফা পদ লইয়া আরবদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। সিরিয়ার শাসন-কর্তা মুয়াবিয়া তালীর পুত্র হাসান ও হোসেনকে বঞ্চিত করিয়া সেই পদ অধিকার (৬৬১-৭৯) এবং ওম্ময়েদ বংশের স্থাপনা করেন। মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এজিদ খলিফা হন (৬৭৯-৮৩)। তাঁহার চক্রান্তে হাসান পূর্বেই নিহত হইয়াছিলেন। এইবার হোসেনের উপরেও তাঁহার অত্যাচার শুরু হইল। অবশেষে হোসেন সপরিবারে মদিনা হইতে ইরাক প্রদেশের কুফা নগরীতে চলিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কুফার পঁচিশ মাইল উত্তরে কারবালার মরু প্রান্তরে এজিদের সৈন্যবাহিনী তাঁহার পথরোধ করিল। নিদারুণ জলকষ্টে এবং শত্রুদের আক্রমণে হোসেন সপরিবারে প্রাণ হারান (১০ই অক্টোবর, ৬৮০)। এজিদের হস্তে ধর্মপ্রাণ হাসান হোসেনের মৃত্যুর কথা আজও পুণ্য মহরমের দিনে মুসলমানগণ স্মরণ করে। খলিফা পদ লইয়া বিবাদের ফলে মুসলমানদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। হাসান-হোসেনের দলের লোকেরা 'শিয়া' বলিয়া পরিচিত হয় এবং ওম্মায়েদ (Omayyad) সমর্থকদের নাম হয় 'সুন্নী'।

আব্বাসীয় খলিফা—ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে আরবদের বহু দূর দূর দেশে যাইতে হয়। আরব সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিল মদিনা, ওম্মায়েদ আমলে উহা দামাস্কাসে স্থানান্তরিত হয়। আরবদের সর্বাধিক উন্নতি হইয়াছিল বাগদাদের আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের রাজত্বকালে। ইঁহারা ছিলেন মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুণ-অল-রসিদ (৭৮৬-৮০৯)। তিনি খুব বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। তাঁহার ন্যায়বিচার ও সুশাসনের জন্য সকলের নিকটই তিনি প্রশংসা পাইয়াছেন। গল্প আছে যে, প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা জানিবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে গভীর রাত্রে রাজধানী বাগদাদ শহরের পথে পথে বেড়াইতেন। টাইগ্রীস নদীর তীরে বাগদাদ শহরের ঠিক মাঝখানে খলিফাদের মর্মর পাথরে গড়া বিরাট প্রাসাদ ছিল। নানা রকম গাছপালা, ফুলের বাগান এবং মূল্যবান সোনারূপার জিনিস, রেশমের পর্দা, গালিচা ও আসবাব পত্রের সাহায্যে প্রাসাদটি সজ্জিত ছিল। তাঁহারা নানারকম বিলাসব্যসনে

দিন কাটাইতেন। বহু পদস্থ রাজকর্মচারী, অসংখ্য সৈন্যসামন্ত, হাজার হাজার ক্রীতদাস সর্বদাই তাঁহাদের আদেশ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। নানা দেশ হইতে গায়ক, কবি; নর্তক, বাদকেরাও খলিফাদের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য রাজদরবারে উপস্থিত হইত।

খলিফারা যে শুধু গানবাজনা লইয়াই মত্ত থাকিতেন তাহা নয়, অনেকে বিদ্যাচর্চাও করিতেন এবং জ্ঞানের আদর করিতেন। বহু ভারতীয়, গ্রীক এবং ইহুদীপণ্ডিত এই সময়ে বাগদাদে আসিয়া সমবেত হইতেন। এই নগরীর বণিকেরা দূর দূর দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বাগদাদকে ধন ও ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ করেন। ভূমধ্যসাগর হইতে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রায় সকল দেশের সহিত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। জাঁক-জমকে ভরা আরব্যোপন্যাসের এই বাগদাদ শহর সে যুগে ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্ররূপে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপলের সহিত তুলনীয়।

কর্ডোভার ওম্মায়েদ সুলতান—বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের সাম্রাজ্য হইতে যে সব রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল স্পেনের ওম্মায়েদ সুলতান। তাঁহারা খুব বিচক্ষণ, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। ইহাদের রাজধানী ছিল **কর্ডোভা** নগরীতে। সাতশত মসজিদ আর তিনশত স্নানাগার এই শহরটির শোভা বর্ধন করিত। মর্মর প্রস্তরে তৈয়ারী চারশত কক্ষযুক্ত সুলতানের প্রাসাদটি ছিল কর্ডোভার প্রধান দর্শনীয় বস্তু। এই রাজদরবার ছিল সমগ্র ইউরোপের আদর্শ। অবশ্য গ্রানাডা শহরে আলহামব্রা প্রাসাদটি স্পেনের আরব স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহাও মর্মর প্রস্তরে



আল্‌হাম্‌ব্রা

তৈয়ারী, আর তাহার উপরে আছে সোনার কারুকার্য্য, দেয়ালে অপূর্ব জাফরির কাজ, এবং রঙ্ তুলির অঙ্কিত ছবি ; এতদিনেও তাহাদের চাকচিক্য এতটুকু মলিন হয় নাই।

আরব শাসনকালে স্পেনের লোকেরা ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে উন্নতি করে। এখানে তখন বহু বিদ্যালয় ছিল, তাহার মধ্যে **কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের** খ্যাতি সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয়। ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় যথা, প্যারিস, অক্সফোর্ড এবং উত্তর ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর কর্ডোভার প্রভাব লক্ষ্যণীয় ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকা হইতেও বহু ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিত। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত বিদেশী ছাত্র ছিলেন জারবার্ট যিনি পোপ দ্বিতীয় সিলভেষ্টার বলিয়া খ্যাত হন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রায় চার লক্ষ গ্রন্থ ছিল।

আরব সভ্যতা—রাজ্যজয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আরবের পারসিক, বাইজেন্টাইন (গ্রীক) এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। আপন সহজাত প্রতিভার সাহায্যে তাহারা সহজেই তখনকার সভ্যজাতিদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে। এছাড়া তাহারা নিজেরাও অনেক নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করিয়া বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। এই ভাবে দেশী, বিদেশী সভ্যতার সাহায্য এবং নিজেদের চেষ্টায় আরবের এক উন্নততর সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল।

আরবের বৃহৎ শহরগুলি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল। কাইরো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১২,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। আরবেরা গ্রীক **বিজ্ঞান** চর্চ্চার উন্নতি করে। যে ইংরাজী সংখ্যা আমরা ব্যবহার করি তাহা আরবদের দান। পূর্বে রোমান সংখ্যা ব্যবহৃত হইত, রোমান সংখ্যায় শূন্য '০' না থাকায় গণনায় বিশেষ অসুবিধা হইত। শূন্য দ্বারা সংখ্যা গণনা ইউরোপীয়রা আরবদের নিকট শিক্ষা করে। আরব স্পর্শমণিতত্ত্বজ্ঞেরা আধুনিক **রসায়ন** শাস্ত্রের অগ্রদূত। তাঁহাদেরই গবেষণার ফলে গন্ধকজাত অম্লরসবিশিষ্ট পদার্থ, তীব্রগন্ধ গ্যাস এবং সম্ভবতঃ বিশুদ্ধ সুরা আবিষ্কৃত হয়। আরবেরা **বীজগণিতের** উৎকর্ষ সাধন করে। আরব প্রতিভা চিত্রশিল্প ও

ভাস্কর্যের পরিবর্তে **স্থাপত্যে** প্রতিফলিত হয়। আরব স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সূক্ষ্ম স্তম্ভ, সূক্ষ্মাগ্র খিলান ও গম্বুজ লক্ষণীয়। কয়েকটি ইংরাজী শব্দের উপর আরব প্রভাব সুস্পষ্ট—এই সব হইতে সংস্কৃতিতে আরবদের অবদান অনুমেয়।

আরবদের মধ্যে অনেক বড় বড় **পণ্ডিত** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতিতে খুবই উন্নতি করেন। চিকিৎসকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় **ইবন্ ইশাখের**। তিনি প্রাচীন গ্রীকদের চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং নিজেও অনেক মৌলিক পুস্তক রচনা করেন। **আবু সিন্না** (৯৮০-১০৩৭) ছিলেন আরেক জন বিখ্যাত আরব চিকিৎসক। তিনি তুর্কিস্থানের বোখারা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্যাপি তাঁহার ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি বহু অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তিনি গ্রীক ও আরবী ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থগুলির সার সঙ্কলন করিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দর্শন, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করেন। **ইবন্ রুশ্দ্** নামে স্পেনের একজন মুসলমান পণ্ডিত ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টট্লের গ্রন্থের উপর একখানি টীকা রচনা করেন। সেই বইখানি আরবেরা তো পড়িতই, এমনকি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েও উহা পাঠ্য ছিল। ইতিহাস চর্চাতে আরবদের পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। তাঁহারা শুধু নিজের দেশেরই নয়, বিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও চর্চা করিতেন। **অল-তবারী** নামে একজন ঐতিহাসিক সৃষ্টির আদিকাল হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত একখানি পৃথিবীর ইতিহাস ('কিতাব') লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে সেই দেশের ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে **ইবন খালদুনই** (১৩৩২-১৪০৬) সর্বপ্রথম তাহা দেখাইয়াছেন। **অল-বিরুণী** (৯৭৩-১০৪৭) নামে আর একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন। এদেশে আসিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান

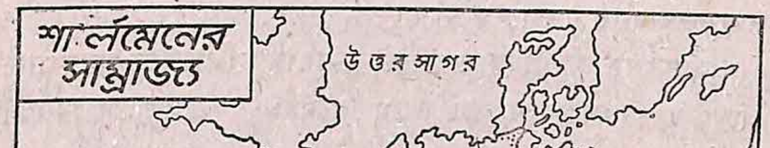
ও ধর্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এই পুস্তকখানি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এছাড়া অল-বিরুণী জ্যোতিষ, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর পরিধি মোটামুটি সঠিক গণনা করেন।

ইউরোপীয় সভ্যতায় আরবদের দান—মধ্যযুগে আরবেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় সভ্যজগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ইউরোপের লোকেরা আরবদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। প্রাচ্য সভ্যতার নানা সম্পদ পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট সহজলভ্য করা আরবসভ্যতার সর্বাধিক বড় অবদান। চৈনিক, ভারতীয়, পারসিক ও গ্রীক সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে এক সমৃদ্ধ সভ্যতা আরবেরা সৃষ্টি করে। আরবেরা হিন্দুদের নিকট গণিতশাস্ত্রের সংখ্যাগুলি এবং বীজগণিত শিক্ষা লাভ করে। গ্রীকদের দর্শন ও বিজ্ঞানের বইগুলি অনুবাদ করিয়া তাহারা সেগুলি রক্ষা করে। চীন হইতে তাহারা কাগজ তৈয়ারীর কৌশল গ্রহণ করে। চিকিৎসা শাস্ত্রে আরব পণ্ডিতেরা নিজেরাই এক যুগান্তর আনেন। শরীর-বিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহাদের অজানা ছিল না; অত্যন্ত কঠিন অস্ত্রোপচারে তাহাদের পারদর্শিতা ছিল; চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাহাদের নিদান পদ্ধতি পরবর্তীকালে বিশেষ আদৃত ছিল। বস্ত্র শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাঁচ তৈয়ারীর কৌশল, চিনি ও মদ্য প্রস্তুত করিবার বিবিধ পদ্ধতি ও কৃষির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বহু প্রাচ্যদেশীয় ফল, ফুল, গাছ তাহারা মধ্যযুগে ইউরোপের অধিবাসীদের সামনে তুলিয়া ধরে।

ষষ্ঠ অধ্যায় | মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (৮০০—১২০০ খ্রীঃ)

শার্লমেন—যে সকল জার্মান উপজাতি পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যে হানা দিয়া তাহার পতন ঘটাইয়াছিল ফ্রাঙ্করা তাহাদের মধ্যে ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। ফ্রাঙ্কদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **শার্লমেন** বা **চার্লস দি গ্রেট**। তিনি ক্যারোলিঞ্জীয় রাজবংশের সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন

একাধারে দিগ্বিজয়ী বীর, সুশাসক ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁহার কর্মসচিব আইনহার্ড শার্লমেনের যে জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। আকৃতিতে শার্লমেন ছিলেন ঠিক



একজন জার্মানের মত। তাঁহার দেহ ছিল দীর্ঘ ও সুগঠিত। তিনি অটুট স্বাস্থ্য ও অক্লান্ত কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। অশ্বারোহণ, শিকার ও সাঁতারে তিনি ছিলেন অসাধারণ পটু। শার্লমেন এক সুনিপুণ যোদ্ধা। তাঁহার ৪৩ বৎসরকাল রাজত্বের (৭৭১-৮১৪ খ্রীঃ) মধ্যে তিনি ৫৪টি যুদ্ধাভিযান করেন। জার্মানীর ব্যাভেরিয়া ও স্যাক্সনি লম্বার্ড ও অধিকৃত ইটালীর বৃহৎ অংশ জয় করিয়া তিনি ফ্রাঙ্ক-সাম্রাজ্যের আয়তন বর্ধিত করেন। এক সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তিনি এই সাম্রাজ্যকে সংহত করেন। সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতির উৎস ছিল সম্রাটের ব্যক্তিত্ব। শার্লমেন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। শাসনকার্যে রাজাকে পরামর্শ দিত সভা বা Diet। স্থানীয় শাসনের ভার ছিল কাউণ্ট নামক কর্মচারীদের উপর। তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিবার জন্য তিনি ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। যে সকল জার্মান জাতির

লিখিত আইন ছিল না শার্লমেন তাহাদের আইন সংকলনের ব্যবস্থা করেন। শার্লমেনের রাজত্বকালে স্যাক্সন ও অন্যান্য বিজিত জাতি খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। শার্লমেনের রাজত্বকালে মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে এক **নূতন অধ্যায়** সংযোজিত করে।

শার্লমেনের অভিষেক ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান—শার্লমেনের রাজত্বকালের স্মরণীয়তম ঘটনা ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট-রূপে তাঁহার অভিষেক। ইহার ফলে দীর্ঘ তিন শতাব্দী পরে পুনরায় পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের উদয় হয়।

এই অভিষেক কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, ইহার পিছনে দীর্ঘকালীন প্রস্তুতি ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের অমরত্বে তখনকার মানুষ বিশ্বাসী ছিল। সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলেও তাহার নামের যাদু মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। তাহারা মনে করিত সাম্রাজ্য এখন দৃষ্টির অগোচরে আছে; শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আবার ফিরিয়া আসিবে। যাহারা রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিল তাহারাও এই সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া চলিল। রোমান সাম্রাজ্য ও রোমান চার্চ—এই দুইএ মিলিয়া ছিল ইউরোপের খ্রীষ্টান জগৎ। একই দেহের যেন দুইটি অঙ্গ। যেহেতু চার্চ বাঁচিয়া আছে সুতরাং লোকে ভাবিত সাম্রাজ্যও মৃত নয়। এই ভাবমানস ও ঐক্যের ধারণা রোমান সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করে।


শার্লমেন

রোমের পোপগণের সহিত পূর্ব রোম-সম্রাটদের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিমের চার্চের ধর্মীয় পার্থক্য তো ছিলই। তাহা ছাড়া বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতি পোপদের মানসিক বিরূপতার একটি কারণ

হইল যে লম্বার্ডদের আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া পোপগণ বারবার পূর্ব রোম-সম্রাটদের কাছে আবেদন করিয়াও কোন সাহায্য পান নাই। অন্যদিকে ফ্রাঙ্কদের সহিত পোপের সম্পর্ক ছিল চিরদিনই মধুর। উভয়ের ল্যাটিন খ্রীষ্টধর্মের মিল ছাড়াও পোপ লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের সাহায্য লাভ করেন। শার্লমেনের পিতা পেপিনের সময়েই পোপ ও ফ্রাঙ্কদের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হয়। সেইজন্য পোপ বাইজেণ্টাইনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পশ্চিমের একজন শক্তিশালী খ্রীষ্টান রাজার সহায়তায় রোমে এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ধর্মরাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হন। সময়টিও ছিল অনুকূল। পূর্ব সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তখন ছিলেন এক ভ্রষ্টা নারী—আইরীন। তিনি নিজ পুত্রকে অন্ধ করিয়া ও অন্যান্য পাপকার্যের দ্বারা সকলের বীতশ্রদ্ধ হন। তাহা ছাড়া ইটালীয়দের বিবেচনায় সিংহাসন তখন শূন্য, কারণ সীজারের রাজ-মুকুট মস্তকে ধারণ করিবার অধিকার কোন নারীর নাই। সেই শূন্য রাজপদে বসিবার যোগ্যতা তখন পশ্চিমে শার্লমেন অপেক্ষা আর কাহারো বেশী ছিল না। তাই বিধর্মী (গ্রীক) বাইজেণ্টাইনের নিকট হইতে রোমের রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া পোপ উহা পশ্চিমের এই যোগ্যতম ও জনপ্রিয় নৃপতিকে দান করিতে মনস্থ করিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে পোপ তৃতীয় লিও শার্লমেনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি একবার রোমে তাঁহার গৃহশত্রুদের কবলে পড়িয়া নির্যাতিত হন। পোপ পলায়ন করিয়া শার্লমেনের রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। শার্লমেন অবিলম্বে রোমে আসিয়া পোপের শত্রুদের শাস্তি দেন। কৃতজ্ঞ পোপ এই উপকারের প্রতিদান দেন নাটকীয় ভঙ্গীতে। নাটকীয় ঘটনাটি ঘটিল ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে। ঐ দিন শার্লমেন সেণ্ট পিটার্স গীর্জায় নতজানু হইয়া উপাসনারত। এমন সময়ে পোপ লিও সহসা শার্লমেনের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মাথায় রোমের সোনার মুকুট পরাইয়া দিলেন এবং রোমান সম্রাটরূপে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সমবেত রোমান জনতা জয়ধ্বনি করিয়া নূতন সম্রাটকে বরণ করিয়া লইল। জীবনীকার আইনহার্ড অবশ্য বলিয়াছেন পোপের অভিপ্রায় পূর্বে জানিলে শার্লমেন হয়তো ঐ দিন গীর্জায় যাইতেন না। পোপের হাত হইতে মুকুট

লইলে পোপের শক্তিবৃদ্ধি পাইবে এরূপ ভয় শার্লমেনের ছিল এবং নিজের উদ্যোগেই সম্রাট হওয়ার বাসনা হয়তো তাঁহার ছিল। যাহা হউক, এই অভিষেকের ফলে পশ্চিমে সাম্রাজ্য ফিরিয়া আসে এবং ফ্রাঙ্ক-রাষ্ট্র **পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য** (Holy Roman Empire) নামে অভিহিত হয়।

অভিষেকের গুরুত্ব—শার্লমেনের অভিষেকের তাৎপর্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ব্রাইসের (Bryce) মতে, এই ঘটনা মধ্যযুগের সমস্ত ঘটনাবলীর কেন্দ্রবিন্দু এবং ইহা না ঘটিলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরূপ হইত কারণ এই ঘটনা নূতন অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া পরবর্তীকালের ইতিহাসের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। অন্যদিকে ব্যারাক্লফ (Barraclough) বলিয়াছেন এই অভিষেক পুরাতন রোম সাম্রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করে নাই, শার্লমেনের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের বিস্তারও হয় নাই। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে শার্লমেনের আধিপত্য ছিল না কারণ ইংলণ্ড, স্পেন ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। অতীতে ফ্রাঙ্করাজ্য যেমন তাঁহার শক্তির মূল উৎস ছিল অভিষেকের পরও তাহাই রহিয়া গেল। এই নূতন সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ীও হয় নাই, সম্রাটের মৃত্যুর পর ইহা দ্রুত সমাধি লাভ করে।

প্রকৃত সত্য এই দুই উক্তির মাঝে নিহিত। পশ্চিম সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই অভিষেকের ফলে শার্লমেন নূতন কোন ভূখণ্ড বা নূতন সম্পদ লাভ করেন নাই সত্য কিন্তু তৎকালীন যুগে যে রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অভূতপূর্ব। এই ঘটনার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই অভিষেকের ফলে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে এবং ইউরোপে এক নূতন সভ্যতার উদয় হয়। রোমান ও বর্বরদের সমন্বয়ের যে প্রক্রিয়া চলিতেছিল তাহা এখন বাস্তব রূপ পাইল। এই সমন্বয়ের ফলে এক **রোমান-জার্মান-খ্রীষ্টান ইউরোপের** ভিত্তি স্থাপিত হয়। মধ্যযুগের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এক নূতন প্রাণ ফিরিয়া পায় যাহা উত্তরকালের রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত করে।

দ্বিতীয়তঃ, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে দুইটি শক্তি প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। একটি শক্তি ছিল বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার প্রবণতা,

অপরটি ঐক্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। শার্লমেনের অভিষেকের ফলে দ্বিতীয় শক্তি জয়লাভ করে।

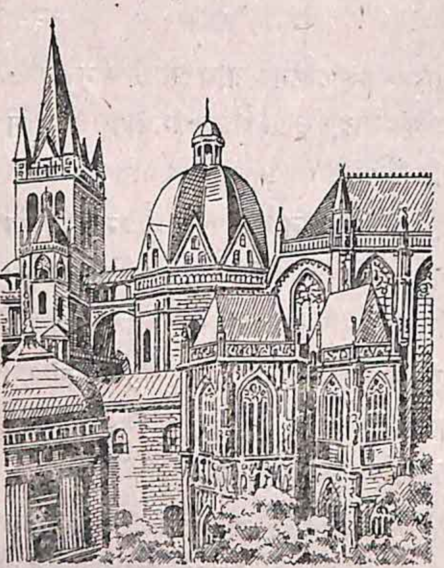
তৃতীয়তঃ, এই অভিষেক এক নূতন রাষ্ট্রীয় ধারণা ও আদর্শকে রূপ দান করে। রাষ্ট্র ও চার্চ এক সুদৃঢ় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শার্লমেনের সাম্রাজ্য এক **ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত** হইল যাহার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। শার্লমেনের সরকার ধর্মীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হইল।

চতুর্থতঃ, এই অভিষেকের মাধ্যমে শার্লমেনের রাজপদ এক নূতন ও পবিত্র রূপ গ্রহণ করে। পূর্বে তাঁহার ক্ষমতার ভিত্তি ছিল সঙ্কীর্ণ। তিনি কেবল ফ্রাঙ্কীয় জনগণের দ্বারা মনোনীত ছিলেন। এখন এই ধারণার সৃষ্টি হইল যে তিনি 'ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত'। এখন 'হইতে শার্লমেন **পার্থিব ও পারলৌকিক** উভয় **বিষয়ের** উপর **সর্বময়** কর্তৃত্ব দাবি করিলেন। খ্রীষ্টধর্মের সংস্কারক ও চার্চের রক্ষাকর্তারূপেও তিনি তাঁহার দাবি উত্থাপন করেন। ফ্রাঙ্ক-রাষ্ট্র এক নূতন নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে শার্লমেনের সময়েই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধারণা জন্ম নেয় যাহা পরবর্তীকালে মধ্যযুগের ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

পঞ্চমতঃ, এই অভিষেকের ফলে পোপের শক্তি বৃদ্ধি হয়। শার্লমেন পোপের হাত হইতে রাজমুকুট লাভ করেন। এই ঘটনার ফলশ্রুতিস্বরূপ পরবর্তীকালে এই মতবাদ বিস্তারলাভ করে যে রাজাকে অভিষিক্ত করিবার অধিকার একমাত্র পোপেরই আছে। সম্রাটগণ ইহা মানিতে অস্বীকার করেন। ইহার ফলে **পোপ ও সম্রাটের** মধ্যে এক **দীর্ঘকালীন** দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যাহা মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। ইহা ব্যতীত এই অভিষেকের ফলস্বরূপ খ্রীষ্টীয় জগতের রাজনীতিতে দুইটি আদর্শ দেখা দেয়—একটি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের, অপরটি পোপতন্ত্রের। কোন্ আদর্শ বড়—এই প্রশ্ন লইয়া উত্তরকালে সংঘাত দেখা দেয়। সুতরাং শার্লমেনের অভিষেক পরবর্তী ইতিহাসের বীজ বহন করে।

ক্যারোলিঞ্জীয় নবজাগরণ—শার্লমেন সাহিত্য ও শিল্পকলার সুমহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কথিত

আছে, আহারের সময় তাঁহাকে ইতিহাস পাঠ করিয়া শোনানো হইত। তিনি জ্ঞানীগুণীজনকে সমাদর করিতেন। তাঁহার রাজসভায় বহু বিদেশী পণ্ডিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন যেমন **আলকুইন**, পিটার, পল দি ডিকন, পলিনাস, থিওডুল্‌ফ প্রভৃতি। ইঁহারা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সহিত তুলনীয়। রাজার উৎসাহে ও উক্ত পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় এই যুগে এক **সাংস্কৃতিক নবজাগরণ** ঘটে। ল্যাটিন ভাষার উন্নতি সাধিত হয়। কাব্য, ইতিহাস ও দর্শনে মৌলিক রচনার সৃষ্টি হয়। স্থাপত্য ও সঙ্গীতের সমৃদ্ধি ঘটে। এই নবজাগরণের মধ্যমণি ছিল সম্রাটের **রাজপ্রাসাদ**। আল্‌কুইন কর্তৃক সংগঠিত এই প্রাসাদ-বিদ্যালয়ে সম্রাট স্বয়ং তাঁহার সন্তান ও সভাসদবর্গের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে মঠগুলি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। অযত্নে জীর্ণ বহু পুরাতন পুস্তকের নূতন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। শার্লমেন তাঁহার রাজধানী **আচেন** নগরীতে এক সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ গীর্জা নির্মাণ করেন। ঐ প্রাসাদ বিনষ্ট হইলেও গীর্জাটি আজও ফ্রাঙ্কীয় স্থাপত্য রীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।



আচেনের গীর্জা

শার্লমেন এইভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে সভ্যতার আলো জ্বালাইয়া রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্প পরেই তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে। ইউরোপে পুনরায় অরাজকতার স্রোত নামে। কিন্তু ব্যাপক জ্ঞানচর্চার যে ধারা তিনি সৃষ্টি করিয়া গেলেন তাহা পরবর্তীকালের ভাঙন ও বিশৃঙ্খলার মাঝেও অব্যাহত থাকে। তাহাই দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের পূর্বসূরী।

মঠ পুরোহিত—অন্ধকার আকাশে তারকার ন্যায় মধ্যযুগে মঠগুলি ছিল সভ্যতার এক একটি আলোকবিন্দু। গীর্জার পুরোহিত বা পাদ্রী-গণের জীবনের আদর্শ ছিল ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করা ও মানুষকে ধর্মপথে পরিচালিত করা। ঈশ্বরের সেবায় তাঁহাদের জীবন নিবেদিত ছিল বলিয়া তাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন করিতেন না। পুরোহিতগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিশপ। বিশপগণ আবার চার প্রকারের ছিলেন—পল্লীবিশপ, শহরের বিশপ, আর্চবিশপ ও পেট্রিয়ার্ক বা পোপ। পেট্রিয়ার্কের স্থান ছিল সবার উর্ধ্বে। বিশপগণ ছিলেন এক একটি খ্রীষ্টীয় সমাজের কর্তা। এইরূপ সমাজকে বলা হইত ডায়োসেস (diocese)। বিশপগণ ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতেন।

অনেক সন্ন্যাসী মঠে বাস করিতেন। নারীগণও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। মঠগুলিতে নারী ও পুরুষ এক সঙ্গে বাস করিতেন। মঠের অধ্যক্ষকে বলা হইত অ্যাবট। সন্ন্যাসিনীরাও (nuns) অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন। অধ্যক্ষগণ মঠ পরিচালনার নিয়মকানুন স্থির করিতেন। রাজা বা জমিদারগণ মাঝে মাঝে যে অর্থসম্পত্তি দান করিতেন তাহাতে মঠের ব্যয় নির্বাহ হইত। মঠে ভোগবিলাস নিষিদ্ধ ছিল। উপাসনা, অধ্যয়ন ও মৌনব্রত পালনের মধ্য দিয়া মঠবাসীদের দিন যাপন করিতে হইত।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে অর্থাৎ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ দিকে সামাজিক ও নৈতিক জীবনে অধঃপতন দেখা দেয়। চার্চগুলি প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তির মালিক হয়। তাহার ফলে চার্চের মধ্যে কলুষ প্রবেশ করে। যাজক শ্রেণী পার্থিব লোভ ও লালসার বশীভূত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কয়েকজন মহান সন্ন্যাসী মানসিক শান্তিকামনায় ও পার্থিব প্রলোভন এড়াইবার জন্য মিশর, সিরিয়া প্রভৃতির মরুভূমি অঞ্চলে গিয়া কঠোর তপস্যা শুরু করেন। এই পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসীদের মধ্যে সেণ্ট, অ্যাণ্টনি, পল দি হারমিট, সেণ্ট সিমিয়ন স্টাইলিটেস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। পার্থিব জগতের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নির্জনে ঈশ্বরের আরাধনা ও নিজ আত্মার মুক্তিই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা anchorites নামে পরিচিত।

কিন্তু ক্রমশঃ আর এক দল সন্ন্যাসী দেখা দিলেন যাঁহারা ইহজগৎকে পরিত্যাগ না করিয়া মঠে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবন যাপন করিতেন। ইঁহারা cenobites নামে খ্যাত। নির্জন সাধনায় বন্দী না থাকিয়া সমবেতভাবে ধর্মজীবনের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব ইঁহারা গ্রহণ করেন। যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব সেইজন্য এই জাতীয় সাধুগণ পলায়নী মনোভাবের পরিবর্তে আর্তের সেবা ও কায়িক শ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। সেণ্ট প্যাকোমিয়াস, সেণ্ট বেসিল ও সেণ্ট বেনেডিক্ট ছিলেন এই শ্রেণীর সন্তদের অন্তর্ভুক্ত।

বেনেডিক্টের নীতি—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেণ্ট বেনেডিক্ট (Benedict) মণ্টে ক্যাসিনোতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতার উপাসনা ও সমাজ সেবাই ছিল তাঁহার ব্রত। তাঁহার মূল নীতি তিনটি—**দারিদ্র্য, সততা ও আনুগত্য**। সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল ভোগ-ঐশ্বর্য পরিত্যাজ্য ও বিবাহ নিষিদ্ধ। সন্ন্যাসীর কোন ব্যাক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, এমন কি বই কলমও নয়। মঠের অ্যাবটের প্রতি সকলকে আনুগত্যের শপথ লইতে হইত। বেনেডিক্ট মনে করিতেন আলস্য আত্মার শত্রু। তাই সকল কাজ মঠবাসীদের নিজের হাতে করিতে হইত। নিয়মিত প্রার্থনা, পাঠ ও দৈহিক শ্রমে তাঁহাদের সর্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইত। বেনেডিক্টীয় পাদ্রীরা কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করিতেন এবং যৌথশ্রমের দ্বারা অনেক অনুর্বর ও পতিত জমিকে সুফলা শস্যক্ষেত্রে পরিণত করেন। 'ক্রশ' ও লাঙ্গল দুইই ছিল তাঁহাদের প্রতীক-চিহ্ন।


কৃষিকার্যে রত পাদ্রীগণ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়—ডমিনিকান্ ও ফ্রান্‌সিস্‌কান। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেণ্ট ডমিনিক্, দ্বিতীয়ের সেণ্ট ফ্রান্‌সিস। পার্থিব জগৎ হইতে পলায়ন

না করিয়া অথচ পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করিয়া ও দারিদ্র্যকে মহৎ গুণ হিসাবে বরণ করিয়া মানবের হিতসাধই ছিল ইঁহাদের ব্রত। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোন কোন দল জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতেন। তাঁহাদের ফ্রায়ার (Friar) বা ব্রাদার বলা হইত। ডমিনিকান্‌দের মধ্য হইতে সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের ন্যায় বিরাট মনীষী-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যাঁহার লেখা আজও আগ্রহের সহিত পঠিত হয়।

সভ্যতায় মঠের অবদান—মধ্যযুগে মঠগুলি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই সকল মঠে বিদ্যালয় বসিত। সন্ন্যাসীগণ শিক্ষকতা করিতেন ও বিদ্যার্থীগণ জ্ঞানলাভ করিতেন। মঠগুলিতে গ্রন্থাগার ছিল। ফাল্‌ডা ও মণ্টে ক্যাসিনোর পাঠাগার বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঐ সকল গ্রন্থাগারে দুর্লভ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করা হইত। জীর্ণ পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করা হইত। এইভাবে অনেক অমূল্য ক্ল্যাসিক সাহিত্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। মঠের সন্ন্যাসীগণ তাঁহাদের সময়কার ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করিতেন। সেই যুগে মঠগুলি বর্তমান কালের সরাইখানা ও হাসপাতালের কাজ করিত, আর্তকে আশ্রয় দান করিত, দরিদ্র ও অসহায়কে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিত। খ্রীষ্টধর্মের অগ্রগতিতে ফ্রায়ারদের অবদান ছিল যথেষ্ট। পাদ্রীগণ তৎকালীন সমাজজীবন ও রাজনীতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। রাজারাও তাঁহাদের অমান্য করিতে সাহস পাইতেন না।

ধর্মসংস্কার—মঠগুলি কালক্রমে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়া আদর্শ ভ্রষ্ট হয়। পাদ্রীদের জীবনে শিথিলতা ও নিষ্ঠার অভাব দেখা দেয়। তাঁহারা আরামপ্রিয় ও অলস হইয়া পড়েন। অনেকের মধ্যে বিবাহাদির ঝোঁক দেখা দেয়। চার্চের মধ্যে দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করে। অর্থের লোভে চার্চের পদ ও জমি বিক্রয় করা হইতে থাকে। এই সকল অনাচার রোধ করিবার জন্য বারবার সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ উঠে। ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বার্গাণ্ডির অন্তর্ভুক্ত ক্লুনীতে (cluny) যে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা এই **সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল** হয়। ক্লুনীর সন্ন্যাসীরা বেনেডিক্টের নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও সামন্ততন্ত্রের কুপ্রভাব

হইতে চার্চকে মুক্ত করিয়া উহার ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষা করাই হইল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পোপের নেতৃত্বে তাঁহারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ব্রতী হন। এই আন্দোলন সাময়িক ভাবে সাফল্য লাভ করিলেও উত্তরকালে আবার চার্চের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য মধ্য যুগের শেষ প্রান্তে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে ইউরোপে ধর্মবিপ্লব শুরু হয়।

পোপ-সম্রাট সংঘর্ষ—পোপ বড় না সম্রাট বড়—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যযুগে এক দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যাহা এই যুগের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। মধ্যযুগে পোপের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পোপের আধ্যাত্মিক প্রাধান্যে তৎকালীন মানুষের বিশ্বাস ছিল। পোপকে মনে করা হইত পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও সকল পার্থিব শক্তির উর্ধ্বে। পোপের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে পোপতন্ত্র সূর্যের ন্যায় ও রাজশক্তি চন্দ্রের ন্যায়। যেহেতু সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা বড় অতএব পোপ রাজার তুলনায় বড়। মানবদেহের ভার রাজার উপর, মানবাত্মার দায়িত্ব পোপের। যেহেতু আত্মা দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং পোপের শক্তি রাজশক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। পোপ ঈশ্বরের নীচে কিন্তু সকল মানুষের উপরে। তাঁহাকে বিচার করিবার অধিকার কাহারো নাই। কিন্তু তিনি সকলের বিচারক এবং ইহলৌকিক পারলৌকিক সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করিবার অধিকারী। রাজশক্তির উৎস মানবিক অহংকার, ঈশ্বরের অনুগ্রহ পোপের ক্ষমতার উৎস। পোপ সব রাজাদের প্রভু।

পশ্চিমে সাম্রাজ্যের পতনের পর পোপ সম্রাটের অনেক ক্ষমতা হস্তগত করেন। পোপ কর্তৃক শার্লমেনের অভিষেক ও পরবর্তী জার্মান সম্রাটগণের (প্রথম আটো, তৃতীয় হেনরী প্রমুখের) পোপের হাত হইতে রাজমুকুট গ্রহণ পোপের প্রাধান্য বৃদ্ধি করে। পোপ দাবি করেন সম্রাটকে অভিষিক্ত করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে।

সম্রাটপক্ষ পোপের এই সব দাবি মানিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা পাল্টা দাবি করেন যে সম্রাটগণ রাজমুকুট দখল করিয়াছেন নিজ অধিকারে এবং পোপের অনুগ্রহে নয়। সম্রাট ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত পার্থিব জগতের

শাসক। তিনি আইন, শৃঙ্খলা ও ধর্মের রক্ষাকর্তা। জাগতিক বিষয়ে তিনি পোপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মধ্যযুগে সম্রাট অনেক সময়ে পোপকে মনোনীত করেন। সম্রাট বিশপ ও অ্যাবটদেরও নিয়োগ করিতেন। ইহাকে পোপ ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাজশক্তির অন্যায় ও উদ্ধত হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিতেন। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও পরাক্রান্ত পোপ সপ্তম গ্রেগরী রাজা কর্তৃক কোন পাদ্রীকে নিয়োগ বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১০৭৫ খ্রীঃ)। ইহাতে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। সম্রাট চতুর্থ হেনরী ও পঞ্চম হেনরীর আমলে এই দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ রূপ নেয়। ১১২২ সালে ওয়ার্মসের চুক্তিতে (Concordat of Worms) দুই পক্ষের আপস-মীমাংসা হয়। কিন্তু আবার হোহেনস্টফেন রাজাদের (ফ্রেডারিক বার্বারোসা, দ্বিতীয় ফ্রেডারিক প্রভৃতি) রাজত্বকালে এই সংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করে ও চরম রূপ নেয়। এই সময় শক্তিশালী পোপ ছিলেন তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, তৃতীয় ইনোসেন্ট প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত পোপ জয়লাভ করেন এবং রাজশক্তি নতি স্বীকার করে।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়—মধ্যযুগে বলা হইত তিন শক্তি পৃথিবীকে পরিচালনা করে, রাজশক্তি (Regnum), যাজকশক্তি (Sacerdotium) এবং বিশ্ববিদ্যালয় (Studium)। সেকালের ও একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য উল্লেখ্য। নিজস্ব ভবন, সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম, সুনির্দিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী, পাঠাগার, কার্যালয়, আর্থিক সংস্থান ও পরিচালক গোষ্ঠী আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সেই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব কিছুই ছিল না। একদল ছাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য যখন শিক্ষকের কাছে যাইত তাহাকেই বিশ্ববিদ্যালয় বলা হইত। কোন স্থানে বিদ্যার্থী ছাত্র ও শিক্ষকের সমাবেশই তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি নাম 'স্টাডিয়াম জেনারেল'। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হইতে শিক্ষার্থীগণ আসিয়া এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়ন করিতে পারিত। স্নাতকগণ যে কোন স্থানে শিক্ষকতা করিতে পারিত।

মধ্যযুগের মঠ ও গীর্জাগুলি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসভূমি। সেযুগের প্রথম দিকে যাজকশ্রেণীই ছিল সমাজের একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং

শিক্ষা বিতরণের ভার তাঁহাদের উপরেই ছিল। মঠ ও গীর্জায় যে বিদ্যালয় ছিল সেখানে প্রধানতঃ ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত। দশম শতাব্দী হইতে ধর্ম-সংস্কারের ঢেউ আসিলে **মঠের** সন্ন্যাসীরা শিক্ষা অপেক্ষা মোক্ষের দিকে অধিক মনোনিবেশ করেন। তখন **গীর্জার বিদ্যালয়**গুলি শিক্ষাদানের দায়িত্ব বহন করিতে থাকে এবং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ক্যান্টারবেরি, লাণ্ডন, রীম্‌স্‌, প্যারিস প্রভৃতি স্থানের গীর্জা-বিদ্যালয়গুলি বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থানের কারণ—দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজে নবচেতনার সঞ্চার হয়। ক্রুসেডের ফলে ইউরোপবাসী গ্রীস ও আরবের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। এই মানসিক নবজাগরণের ফলে কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় তাহাদের জ্ঞানপিপাসা মিটিল না। আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য গভীর আগ্রহ দেখা দিল। তখন **ধর্মনিরপেক্ষ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা** ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইল যাহা একজন মানুষকে ডাক্তার, আইনজীবী ইত্যাদি রূপে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করিতে সহায়তা করে। বিশ্ববিদ্যালয় এই চাহিদার ফলশ্রুতি। **চার্চের** তরফ হইতেও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল যেখানে বিধর্মীদের হাত হইতে চার্চকে রক্ষা করিবার জন্য ছাত্রদের শিক্ষাদান করা যায় এবং চার্চের বিশাল সংগঠন পরিচালনার জন্য যোগ্য কর্মী তৈয়ারী করিবার প্রয়োজনও ছিল। **সামন্ত প্রভুগণ** এবং **রাজন্য**-বর্গ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন ও ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষিত এক দল নূতন বেসামরিক কর্মচারীর প্রয়োজন অনুভব করিলেন। উদীয়মান **শহর**-গুলিও একই প্রয়োজন বোধ করে। উপরন্তু নূতন সম্মান লাভের আশায় ও বাণিজ্য বিস্তারের আগ্রহে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ—প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেমন বোলোগ্‌না ও প্যারিস) আদিরূপ গীল্ড (guild)। তখনকার ছাত্রগণ বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইত, যেমন সুলভ পুঁথির অভাব, পুস্তকের স্বল্পতা, স্থায়ী ছাত্রাবাসের অভাব, ঘর ভাড়ার উচ্চহার, খাদ্যদ্রব্যের

অত্যধিক মূল্য, নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চনা ইত্যাদি। এইসব অসুবিধা হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য ছাত্রগণ তাহাদের সমিতি বা গীল্ড গঠন করিত। শিক্ষকদেরও বহু সমস্যা ছিল। বিনা ছুটিতে একদিনের জন্যও কেহ অনুপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। শহর পরিত্যাগ করিতে চাহিলে ফিরিয়া আসার নিশ্চয়তা স্বরূপ তাঁহাকে অর্থ জমা রাখিতে হইত। তাঁহার বক্তৃতা শোনার জন্য পাঁচজন শ্রোতা সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইত। অধ্যাপক বিবাহের পর মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য মাত্র একদিন ছুটি পাইতেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষকগণ আত্মরক্ষার্থে তাঁহাদের নিজস্ব গীল্ড গঠন করেন। বোলোগ্‌নাতে ছাত্রদের গীল্ড ও প্যারিসে শিক্ষকদের গীল্ড ছিল তখনকার দুইটি আদর্শ সংগঠন যাহার অনুকরণ অন্যেরা করিত। ছাত্র ও শিক্ষকদের গীল্ডের সমন্বয়ে বোলোগ্‌না বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের গীল্ডের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইহা চার্চের কর্তৃত্ব ও রাজআদালতের বিচারের আওতা হইতে অব্যাহতির চেষ্টা করে। রাজকর দান ও সৈন্যদলে যোগদান ইহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ) পার্লামেণ্টে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইত। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব জেলখানা ছিল।

কিছু বিশ্ববিদ্যালয় গীর্জার বিদ্যালয়গুলি হইতে বিকাশ লাভ করে। নতার্দামের ক্যাথিড্রাল স্কুল হইতে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। রাজাদের অনুগ্রহ ও পোপের সমর্থন আবার কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থানে সহায়তা করে। নূতন শিক্ষা আন্দোলন তাঁহাদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হইবে মনে করিয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে পৃথক সনদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিশেষ অধিকার বা অব্যাহতি দান করেন। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের অধিকার রক্ষার্থে সনদ দেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক নেপল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্রাট চতুর্থ চার্লস্ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ নবম গ্রেগরী তুলো (Toulouse) বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করেন।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (জার্মানীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়) রাজানুগ্রহে স্থাপিত হয়।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের **বিক্ষুব্ধ ছাত্রগণ** বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। সম্ভবতঃ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজ ছাত্রদের একটি দল অক্সফোর্ডে গিয়া সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। অনুরূপভাবে অক্সফোর্ডের এক দল ছাত্র পৃথক হইয়া ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করে। বোলোগ্না হইতে পাডুয়া ও প্রাগ হইতে লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল একই ভাবে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পূর্ণবিকাশ হয়। মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

ইউরোপে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সালের্নো, বোলোগ্না ও প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে সালের্নো ছিল প্রাচীনতম ও প্যারিস শ্রেষ্ঠ। সালের্নো চিকিৎসাশাস্ত্রে, বেলোগ্না আইনশাস্ত্রে ও প্যারিস ধর্মশাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত ছিল। বর্তমান কালের ন্যায় কোন মহান শিক্ষক ও পণ্ডিতের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত। বোলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত রোমান আইনের সুপণ্ডিত শিক্ষক **ইর্নেরিয়াসের** নাম যুক্ত হইয়া আছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটমণি ছিলেন তখনকার দিকপাল পণ্ডিত **পিটার অ্যাবেলার্ড**। তিনি অন্ধবিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তির উপর বেশী জোর দেন। তাঁহার জ্ঞানের খ্যাতি এতদূর ছড়াইয়াছিল যে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য শহরে প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্রের সমাবেশ হইত। একবার শত্রুদের ভয়ে পলায়ন করিয়া তিনি ট্রয় নগরীর নিকটে এক নির্জন স্থানে আত্মগোপন করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনে। সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে 'স্কুলম্যান' বা 'স্কলাস্ টিকস্' বলা হইত। ইঁহারা যুক্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন। **অ্যাবেলার্ড, অ্যালবার্ট ম্যাগনাস, টমাস অ্যাকুইনাস রজার বেকন্** ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্কুলম্যান। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত ছিলেন বেকন্। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে চার প্রকার পাঠের ব্যবস্থা ছিল—ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসা, আইন ও কলাবিদ্যা। কলাবিদ্যা

বলিতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বুঝাইত। **ছাত্রসমাজ**—**ছাত্রগণ** সেযুগে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। **শিক্ষকদের তাহারা নিয়ন্ত্রণে আনিতে সক্ষম** হয়। কোন শিক্ষকের ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। পাঠনের কাজে সুশৃঙ্খলভাবে ও এক বছরের পাঠ্যক্রম হিসাব করিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইত। কেহই কেবল ভূমিকা ও গ্রন্থ নির্দেশ করিয়া সারা বছর কাটাইয়া দিতে পারিতেন না। সেকালের ছাত্ররা ছিল অনেকটা এখনকার ছাত্রদের ন্যায়। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। তাহাদের বিভিন্ন সমিতির (যাহাদের 'নেশন' বলা হইত) মধ্যে রেষারেষির ফলে অনেক সময় পাঠগৃহের অভ্যন্তরে দাঙ্গা বাধিত। ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া শহরে যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইত। শহরবাসী ইহার প্রতিবাদ করিলে দাঙ্গা বাধিয়া যাইত। ইহাকে বলা হইত 'টাউন-গাউন-ফাইট।' ছাত্ররা এক বিশেষ ধরনের পোষাক পরিত, তাই 'গাউন' বলিতে ছাত্রসম্প্রদায়কে বুঝাইত। অক্সফোর্ড, প্যারিস, রোম প্রভৃতি সব শহরেই ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা যাইত। শিক্ষকদের ঢিল ছোঁড়ার জন্য একবার লিপ্‌জিগের ছাত্রদের জরিমানা করা হইয়াছিল। অথচ যে সৎ ছাত্র সে সকালের ঘণ্টা বাজিবার পূর্বেই ঘুম হইতে উঠিয়া পড়িত, ঠিক সময়ে ক্লাশে হাজির থাকিত, নিয়মিত পাঠ্যভ্যাস করিত ও রাত্রে বিছানায় শুইয়াও পড়া মুখস্থ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী না থাকায় কোন ভাড়া করা ঘরে বা গীর্জায় ক্লাশ বসিত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ল্যাটিন ভাষা। ছাত্রদের ঐ ভাষায় কথা বলিতে হইত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান—মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জনমত গঠনে সহায়তা করে। ইহারা যুক্তিবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে ও সমগ্র ইউরোপকে একটি বুদ্ধিগত ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে। দর্শন ও আইন শিক্ষা প্রসার লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল সৃজনশীল চিন্তাধারার আবাস এবং ইউরোপের নবজাগরণের অগ্রদূত।

সামন্ততন্ত্র ছিল মধ্যযুগে ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রধানতম ও জটিলতম প্রতিষ্ঠানের একটি। সাধারণতঃ ৮০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ফিউডাল বা সামন্ত যুগ বলা হয়। সামন্তপ্রথা ছিল এক বিশেষ ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যাহা ইউরোপে মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে প্রচলিত ছিল এবং যাহার পূর্ণবিকাশ ঘটে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। জমি চাষের ব্যবস্থার সহিত সামরিক কর্তব্যপালনের সমন্বয়ই সামন্তপ্রথার মূল কথা। এই প্রথা সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত করে। **জমিই ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গ্রন্থি।** 'ফিফ' (Fief) বা 'ফিউডাম্' (Feudum) শব্দ হইতে ফিউডাল কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ জমির ইজারা বা চাক্‌রান ভূসম্পত্তি। জমির মালিক ও প্রজাদের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হইত। এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী জমিদার প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন এবং প্রজারা সেবা ও আনুগত্য দান করিত। আমাদের দেশের আগেকার দিনের জমিদারী প্রথার সহিত এই সামন্তপ্রথার কতকটা সাদৃশ্য আছে।

সামন্তপ্রথার বৈশিষ্ট্য—জমির হস্তান্তর সামন্ততন্ত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহার মধ্য দিয়াই পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হইত। দেশের সমস্ত জমির মূল মালিক ছিলেন রাজা বা সম্রাট। তিনি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ভূসম্পত্তির একটি প্রধান অংশ নিজের অধীনে রাখিয়া বাকী অংশ লর্ড বা নোব্‌লদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। রাজার নিকট হইতেই লর্ড বা প্রধান জমিদারগণ সরাসরি জমির অধিকার লাভ করিতেন। তাহার জন্য লর্ডদের রাজাকে খাজনা দিতে হইত ও যুদ্ধের সময় নিজের দল-বল লইয়া রাজার পক্ষে লড়াই করিতে হইত। লর্ডরা আবার তাঁহাদের অনুচরদের মধ্যে জমি বণ্টন করিতেন। এই অনুচরদের বলা হইত ভ্যাসাল্। তাঁহারা ছিলেন ছোট জমিদার। ভ্যাসাল হইলে সামাজিক মর্যাদার হানি হইত না, কারণ লর্ড ও ভ্যাসাল্ উভয়েই ছিলেন সমাজের ভূস্বামী সম্প্রদায় ও অভিজাত শ্রেণী। বেশীর ভাগ লর্ড নিজেরাই

ছিলেন ভ্যাসাল এবং সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত লর্ড ছিলেন রাজার ভ্যাসাল্। একটি মর্যাদামণ্ডিত সুগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লর্ড ভ্যাসালকে জমি দান করিতেন এবং ভ্যাসাল্ লর্ডের নিকট নতজানু হইয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতেন।

জমি দানের সর্ত ছিল জমি অধিকারীগণ উর্ধ্বতন প্রভুকে অর্থে ও সামর্থ্যে নানা ভাবে সহায়তা করিবে। এই সেবার দায়িত্ব ছিল মূলতঃ তিন প্রকারের। প্রথমতঃ, ভ্যাসালকে স্বয়ং যোদ্ধা হিসাবে উপস্থিত থাকিয়া অথবা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রভুকে যুদ্ধের সময় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে সহায়তা করিতে হইবে। এই দিক দিয়া সামন্তপ্রথা ছিল একটি সামরিক প্রথা। দ্বিতীয়তঃ, ভাসাল্কে প্রভুর আদালতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বিচারকার্যে সাহায্য করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ভ্যাসাল্কে জমির জন্য খাজনা ও নানা প্রকার কর দিতে হইত। স্কুটেজ (scutage) নামক কর দিয়া সামরিক কাজ হইতে অব্যাহতি মিলিত। লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাইট রূপে অভিষেকের সময় ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় ভ্যাসাল্কে কর (aid) দিতে হইত। লর্ড বা ভ্যাসালের মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকার লাভের জন্যও কর (relief) দিতে হইত। নাবালক পুত্রকে রাখিয়া কোন ভ্যাসালের মৃত্যু হইলে লর্ড ঐ পুত্রের নাবালক অবস্থায় তাহার আইনসঙ্গত অভিভাবক রূপে ঐ জমির আয় ভোগ করিতেন। ইহাকে বলা হইত wardship।

লর্ডেরও ভ্যাসালের প্রতি অনেক দায়িত্ব ছিল। প্রধানতম দায়িত্ব ছিল দুইটি—বিপদ ও শত্রুর হাত হইতে ভ্যাসাল্কে রক্ষা করা এবং তাঁহার প্রতি সকল অন্যায়ের প্রতিকার করা, বিশেষ করিয়া বিচারালয়ে তাঁহার ন্যায়বিচার লাভের ব্যবস্থা করা।

সুতরাং লর্ড ও ভ্যাসালের সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত, চুক্তিভিত্তিক ও পারস্পরিক অধিকার প্রসূত। ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতা সামন্ত প্রথার একটি বৈশিষ্ট্য। অপেক্ষাকৃত দুর্বল সবলের উপর নির্ভর করিত। সামন্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারগণ ব্যক্তিগত বন্ধনের দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য অপেক্ষা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের

ভিত্তিতেই সামন্তপ্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভ্যাসালের সহায়তা ও সেবাকে লর্ড যেমন নিজ অধিকারলব্ধ মনে করিতেন, ভ্যাসালও সেইরূপ লর্ড কর্তৃক তাঁহাকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বীয় অধিকারপ্রসূত বলিয়া গণ্য করিতেন। এই চুক্তিপালন উভয় পক্ষের নিকট বাধ্যতামূলক ছিল এবং একটি পবিত্র দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইত। কোন পক্ষ চুক্তির সর্ত না মানিলে বা লঙ্ঘন করিলে অপর পক্ষও চুক্তির দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইত। কিন্তু চুক্তি অমান্য করা বিশ্বাসভঙ্গের সামিল বলিয়া নিন্দিত ছিল।

সামন্ততন্ত্রের গঠন ছিল **পিরামিডের ন্যায়**। সবার উপরে ছিলেন রাজা, তাঁহার নীচে লর্ডগণ, তাহার ছোট ভূস্বামীগণ এবং একেবারে তলায় ছিল ভিলেন বা সার্ফ, যাহারা জমি চাষবাস করিত। বাহুবল ও পরিস্থিতির চাপে এই কাঠামো গড়িয়া উঠে। ক্ষমতায় ও অর্থবলে বলীয়ান অভিজাত শ্রেণী সমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে।

ফিউডাল প্রথা ছিল এক বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে জমির মালিক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন। রাজার দুর্বলতা কিংবা শাসন-অক্ষমতার সুযোগ লইয়া ফিউডাল লর্ডগণ শাসনক্ষমতা দখল করেন। এইভাবে রাজার সার্বভৌম শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হইয়া লর্ডদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড রূপে ভাগ হইয়া যায়। রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া লর্ডগণ নিজ নিজ অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন শাসক হইয়া দাঁড়ান। তাঁহাদের নিজস্ব এলাকায় তাঁহারাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সেই অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায়বিচার, দরিদ্র ও অসহায়কে প্রতিপালন, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা প্রভৃতির দায়িত্ব ছিল জমিদারদের উপর। এই আঞ্চলিক স্বাধীনতা ফিউডাল প্রথার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামন্ত সমাজে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে অসংখ্য ছোট ছোট সরকার দেখা দেয়। সরকার ব্যক্তিগত বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তিবিশেষ জনসাধারণের দায়িত্ব ও অধিকার গ্রহণ করে। তাই সামন্ত প্রথাকে 'ব্যক্তিভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা' বলা হইয়া থাকে।

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কারণ—শার্লমেনের মৃত্যু ও তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙনের ফলে পশ্চিম ইউরোপে নবম ও দশম শতাব্দীতে আবার অরাজক

অবস্থা দেখা দিল। সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল এবং বিশৃঙ্খলায় চারিদিক ছাইয়া যায়। ভিতরের অরাজকতার সহিত আসিয়া মিশিল বাহির হইতে বর্বর-আক্রমণের স্রোত। হাঙ্গেরীয়রা ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যুগণ এই সময় বারবার আক্রমণ করে। রাজারা অনেক ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টায় এই বর্বর জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হইলে নোব্‌লরা রাজার ক্ষমতা হস্তগত করে। এই অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্য স্থায়ী ও সবল শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি হয়। আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। আশ্রয়দাতারা হইলেন লর্ড এবং আশ্রিতেরা ভ্যাসাল্। এইভাবে সমাজে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। আত্মরক্ষার জন্য গীর্জা, মঠ ও শহরগুলিও এই প্রথার অংশীদার হয়।

সামরিক দিক হইতে সামন্তপ্রথার উত্থানের পিছনে ফ্রাঙ্কীয় নেতা চার্লস্ মর্টেলের অবদান রহিয়াছে। তাঁহার সময়েই জমিদারদের নিকট হইতে সামরিক দায়িত্ব পালন বেশী পরিমাণে দাবি করা হইয়া থাকে। স্যারাসেন ও মোঙ্গলীয় বর্বর জাতিদের অশ্বারূঢ় সৈন্যের বিরুদ্ধে পদাতিক সৈন্যের নিষ্ফলতা বুঝিয়া তিনি অশ্বারোহী বাহিনী সৃষ্টি করিলেন। এই উদ্দেশ্যে নিজের জমি পর্যাপ্ত না থাকায় চার্চের জমি দখল করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে সামরিক সেবার সর্তে নূতন ভূস্বামীদের তিনি সেই জমি দান করিলেন। ফিউডাল বীর প্রথার সেই সূচনা।

এই সামন্তপ্রথার কিছু কিছু বীজ শেষের দিকের রোমান সমাজে ও আদি জার্মান সমাজে দেখা যায়। কনফুসিয়াসের সময় চীনে, মধ্যযুগে জাপানে, মিশরে প্রাচীন রাজবংশের বিলোপের পর এবং ভারতে গুপ্তদের পরবর্তীকালে এই জাতীয় প্রথা দেখা গিয়াছে।

সামন্তদের দুর্গ—সামন্ত সমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিল সামন্ত প্রভুদের দুর্গ। ফিউডাল প্রথার ন্যায় এই দুর্গের উদ্ভব হয় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। প্রাকৃতিক বিপদ ও বহিঃশত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার প্রয়োজনে তখন লোকে এই সব দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিত। এই প্রাসাদ-দুর্গের

উদ্ভব হয় নবম শতাব্দীতে। প্রথম দিকে উহা কেবল প্রাচীর-বেষ্টিত গুহা ও কাঠের বাড়ীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদের প্রচলন হয়। আত্মরক্ষার দিকে নজর রাখিয়া নোব্‌লরা এই সব দুর্গ তৈয়ারী করিতেন। তাই সাধারণতঃ কোন উচ্চস্থানে পর্বতশীর্ষে কিংবা পাহাড়ী নদীর ধারে এই দুর্গ গড়িয়া উঠিত। দুর্গের চতুর্দিকে একটি খোলা জায়গা থাকিত, তাহাকে বলা হইত বেইলী। শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ঐ স্থান উচ্চ দেওয়ালের দ্বারা বেষ্টিত থাকিত এবং তাহাতে বুরুজ থাকিত যাহার মধ্য দিয়া তীর, বর্শা, গরম তেল ইত্যাদি বস্তু শত্রুপক্ষের উপর নিক্ষেপ করা যাইত। ঐ দেওয়ালের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত জলপূর্ণ পরিখা। শত্রুকে দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে ঐ পরিখা পার হইয়া আসিতে হইত। তাই পরিখার পাড় থাকিত খুব খাড়া এবং পরিখা এমন চওড়া ও গভীর করিয়া কাটা হইত যাহাতে শত্রু সহজে ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। পরিখা হইতে মাটি তুলিয়া সেই মাটি স্তূপ করিয়া ভিতরের চারিদিকে প্রাচীরের মত করা হইত। স্তূপের উপর খুঁটি পুঁতিয়া লর্ডের বাড়ী বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইত। এই বাড়ী নির্মিত হইত পাহাড়ের একেবারে উপরে। দুর্গে পরিখার উপরে প্রবেশের জন্য থাকিত একটি অস্থায়ী টানা সেতু এবং প্রবেশ-দরজার সহিত ছিল তাহার সংযোগ। প্রয়োজনমত সেই সেতু পাতিয়া দেওয়া হইত এবং প্রয়োজন না থাকিলে গুটাইয়া রাখা হইত। প্রবেশদ্বারে যে ভারী লোহার দরজা থাকিত তাহাকে বলা হইত পোর্টকুলিস। টানা সেতু তুলিয়া লইলে লোহার দরজাও নামাইয়া দেওয়া হইত। ইহাই ছিল দ্বিমুখী রক্ষাব্যবস্থা। খোলা ময়দানের ভিতরে ও বাহিরের প্রাচীরের মধ্যে থাকিত আস্তাবল, রন্ধনশালা, গুদামঘর, ভৃত্যাদির গৃহ, গীর্জা প্রভৃতি। সাধারণতঃ গৃহগুলি ছিল



সামন্তদের দুর্গ

কাঠের। যুদ্ধের সময়ে প্রজারা তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া এই বেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় লইত। বেষ্টনীর মধ্যভাগ দুর্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ইহার নাম ডোনজন (donjon)। এইখানে ছিল লর্ডের প্রাসাদ। সাধারণতঃ এই প্রাসাদ ছিল প্রস্তর-নির্মিত চতুষ্কোণ বা গোলাকার উচ্চ অট্টালিকা।

লর্ডের অট্টালিকায় থাকিত কয়েকটি শয়নকক্ষ ও একটি বড় হল-ঘর। প্রাসাদগুলি আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত হইত বলিয়া সেখানে কোন বড় জানালা থাকিত না। দেয়াল ছিল খুব পুরু ও উঁচু। দেয়ালে লম্বা গর্ত থাকিত এবং তাহা জানালা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। উহার মধ্য দিয়া আক্রমণকারী শত্রুদের উপর তীর-বর্শা নিক্ষেপ করা যাইত। গৃহের মধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। তাই কামরাগুলি ছিল অন্ধকার ও ম্লান। পাথরের দেওয়ালগুলি থাকিত ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে। তাহার গর্তগুলি নানা প্রকারের পর্দা দিয়া ঢাকা থাকিত। দুর্গের বিষণ্ণ ম্লানিমার মধ্যে ঐ সুন্দর পর্দাগুলি ছিল বৈচিত্র্যস্বরূপ। মোমবাতি বা মশালের সাহায্যে গৃহ আলোকিত হইত। প্রাসাদের বড় হল-ঘরটি ব্যবহৃত হইত প্রভুর দরবার ও আহার-কক্ষ হিসাবে। সেখানে আসবাবপত্রের ব্যবস্থা ছিল সামান্য। ঘরের মধ্যে আগুন রাখার ব্যবস্থা থাকিত, তাহার দ্বারা স্যাঁতসেতে ঘরগুলি গরম রাখা হইত। মেঝেতে খড় বিছানো থাকিত ও সেগুলি প্রায়ই না বদলানোর ফলে ঘর নোংরা হইয়া থাকিত। কার্পেটের ব্যবহার ছিল অল্প, কারণ উহা বিলাসদ্রব্য রূপেই ব্যবহৃত হইত। শয়ন-ঘরেও আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল না, থাকিত লেখার টেবিল, কয়েকটি সিন্দুক ও বিরাট বিছানা। বিছানা থাকিত একটি মঞ্চের উপরে এবং উপরে একটি মোটা কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙানো থাকিত। প্রত্যেক দুর্গে ইঁদারা থাকিত এবং সীসার পাইপের সাহায্যে জল আনার ব্যবস্থাও ছিল।

নোব্‌লদের জীবনধারা—দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া একটি নোব্‌ল বা অভিজাত পরিবারের জীবন গড়িয়া উঠিত। দুর্গের জীবন ছিল রুক্ষ, কঠোর এবং সরল। মধ্যযুগের মানুষ বেশ ভোজনবিলাসী ছিল। খাদ্যের পরিমাণ ছিল প্রচুর কিন্তু বৈচিত্র্যময় নয়। মাংস, মাছ ও পাখীর মাংসের বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইত। আবার পেঁয়াজ, কপি, বিট, শিম,

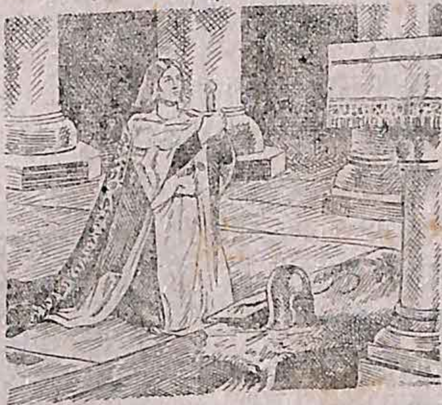
প্রভৃতি তরিতরকারিরও ব্যবহার ছিল। ফলের মধ্যে থাকিত আপেল, পিয়ারা, চেরী, কুল ইত্যাদি। দুধ হইতে পনির ও মাখন তৈয়ারী হইত। চা ও কফির প্রচলন তখন ছিল না। পানীয়ের মধ্যে প্রধান ছিল মদ, ফলের রস ও মধু। চিনি না থাকায় আর কোন মিষ্টান্ন ছিল না। ক্রুসেডের ফলে মশলাপাতি আমদানির পূর্ব পর্যন্ত রান্না ছিল খুবই সাদামাঠা।

দুর্গে নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। নোব্‌লদের আমোদ-প্রমোদ খুব বুদ্ধিদীপ্ত ছিল না। তাঁহাদের বৃত্তি-ভোগী ভাঁড়, গায়ক, ক্রীড়াবিদ প্রভৃতি থাকিত। যে সব নোব্‌ল কিছু দিন চার্চে জীবন যাপন করিয়াছেন ও শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল পড়াশুনা করিতেন ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। সাধারণ নোব্‌লদের আমোদ-প্রমোদ ছিল ভিন্ন ধরনের। যুদ্ধবিগ্রহ, শিকার, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই ছিল তাঁহাদের প্রিয় বস্তু। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে বলা হইত টুর্নামেণ্ট। দুই দল নাইটদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার জন্য বর্শা দিয়া কৃত্রিম যুদ্ধ হইত। যিনি প্রতিপক্ষকে ঘোড়া হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিতে কিংবা তাঁহার বর্শা ভাঙিয়া দিতে পারিতেন, তাঁহারই জয় হইত।

অভিজাত শ্রেণীর সন্তানকে শৈশবে মাতার পালনাধীনে রাখা হইত। সাত বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার পিতা বালক-ভৃত্য রূপে কাজ করিবার জন্য কোন বীর অনুচরের নিকট তাহাকে পাঠাইতেন। তখন তাহাকে **পেজ** বা ভার্লেট বলা হইত। চতুর্দশ বৎসর বয়সে ঐ বালক **স্কোয়ার** পদবী পাইত তখন তাহাকে যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বারোহণ, অসি ও বর্শা চালনা, ঢাল ধরা প্রভৃতি শিখিতে হইত এবং বীরোচিত আচার-ব্যবহার অভ্যাস করিতে হইত। লর্ড বা লর্ডের সহচর নাইটগণ এবং পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ তাহাকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। পেজ থাকাকালীন সে দুর্গপ্রাসাদে বাস করিত। কিন্তু স্কোয়াররূপে উন্নত হইবার পর তাহাকে নাইটের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত। একুশ বৎসর বয়সে স্কোয়ার **নাইট** পদবীতে ভূষিত হইত।

নাইট ও শিভাল্‌রী—একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাইটকে অভিষিক্ত করা হইত। রাজা বা লর্ড এই পদবী দান করিতেন। এই **অভিষেক**

উৎসবে চার্চের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রার্থী পবিত্র হওয়ার জন্য স্নান করিয়া আসিত। ইহাকে বলা হইত 'পবিত্র হওয়ার জন্য অবগাহন'। তাহার পর উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহাকে নিজ অস্ত্রের উপর নজর রাখিতে হইত। আপন তরবারি হাতে লইয়া ভাবী নাইটকে গীর্জার বেদীর সম্মুখে প্রার্থনা করিতে হইত। তাহার পর পুরোহিত সেই তরবারি তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিতেন। তখন নাইটকে পদবীদাতা লর্ডের সম্মুখে হাঁটু মুড়িয়া বসিতে হইত। লর্ড তাহাকে নাইটের কর্তব্য ও আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতেন। অতঃপর তাহার কাঁধে তিনবার আঘাত দিয়া এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিতেন ঃ "ঈশ্বরের নামে, সেণ্ট মাইকেল ও সেণ্ট জর্জের নামে আমি তোমাকে নাইটরূপে চিহ্নিত করিলাম, বীর হও, সাহসী হও, প্রভুভক্ত হও।" নাইট তখন লাফ দিয়া ঘোড়ায় চড়িত এবং অস্ত্রচালনায় তাহার পারদর্শিতা প্রমাণ করিত। এইরূপ ছিল নাইটের শিক্ষা পদ্ধতি।



নাইট

নাইটগণ যে আচরণ ও আদর্শ অনুসরণ করিতেন তাহার নাম ছিল শিভাল্‌রী (chivalry) বা বীরব্রত। জার্মান উপজাতীয় প্রথায়, খ্রীষ্টীয় নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শে এবং স্যারাসেন সমাজে এই শিভাল্‌রীর ভাবধারার বীজ উপ্ত ছিল। শিভাল্‌রীর আচরণবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। ইহার মূলকথা হইল প্রভুভক্তি, বিনয়, ভদ্রতা, তেজস্বিতা, আনুগত্য, চার্চের শত্রুকে প্রতিহত করা ও ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যপালন, নারীর সম্মান রক্ষা, দুঃস্থ ও অনাথের দুর্দশা মোচনে সর্বস্ব পণ, এবং ন্যায় ও ধর্মের জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করা ও জীবনদান। এই সকল আচরণের পিছনে ছিল নৈতিক

চেতনা। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শিভাল্‌রীর ভাবধারা শীর্ষে আরোহণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই শিভাল্‌রীর উত্তরকালে ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। শিভাল্‌রীর যুগ অন্তর্হিত হওয়ার পর নাইটরা বড় বড় কথার আড়ালে অনেক অপকর্ম ও বিশেষ করিয়া সাধারণ শ্রেণীর লোকেদের উপর দুর্ব্যবহার করিতেন। ঐ নীতিগুলি সংস্কারে পরিণত হয় ও নাইটদের নির্বোধ আচরণে অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর রূপ ধারণ করে। সামন্তপ্রথার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অধঃপতন দেখা দেয়। নাইটদের মধ্যে অহমিকা ও ঔদ্ধত্য আসে। শিভাল্‌রীর এই অধোগামী রূপকে ব্যঙ্গ করিয়া অমর কাব্য 'ডন্ কুইক্‌সোট' রচিত হইয়াছে। তথাপি মধ্যযুগের সমাজে এই বীরপ্রথার সুসভ্য প্রভাব অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। শিভাল্‌রী আভিজাত্যবোধের সৃষ্টি করে। অভিজাত পরিবারগুলি তাহাদের পোষাকে, বর্মে ও শিরস্ত্রাণে এই আভিজাত্যের প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করিত। চীনে ড্রাগন, জাপানে ক্রিসেন্‌থিমাম ও আজ্‌টেকের ঈগল ছিল বিখ্যাত প্রতীক-চিহ্ন।

সামন্তপ্রথার দোষগুণ—সামন্তপ্রথার ত্রুটি অনেক। রাজনৈতিক ক্ষমতা ভূস্বামীদের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ভূস্বামীগণ ক্ষমতা ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হইয়া নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধ ছিল সামন্ত সমাজের অভিশাপ। ইহাতে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হইত। এইজন্য সামন্ত প্রথাকে বলা হয় 'সুসংগঠিত অরাজকতা'। সামন্তসমাজ যে পশু বলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল শুধু তাহাই নয়, এই সমাজ ছিল অনড়, নিশ্চল ও গতিহীন। জমির উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল। এই সমাজের ভিত্তি ছিল শোষণ। লর্ডরা ভ্যাসালদের শোষণ করিতেন এবং সার্ফরা ছিল শোষিত ও নির্যাতিত।

তবু মধ্যযুগের সভ্যতায় সামন্তপ্রথার অবদান নিঃসন্দেহে মূল্যবান। তৎকালীন ইউরোপে যে বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য সামন্ততন্ত্রই ছিল কালোপযোগী ব্যবস্থা। ফিউডাল লর্ড ও নাইটগণ বর্বর জাতিদের আক্রমণ হইতে

ইউরোপকে রক্ষা করেন। সামন্তদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল সেকালের মানুষের নিশ্চিত আশ্রয়স্থল। সামন্তপ্রথা ইউরোপীয় সমাজে একটি স্থায়িত্ব বিধান করে এবং আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এই প্রথা আত্ম-নির্ভরতার বিকাশ ঘটায় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্পৃহাকে জাগ্রত রাখে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল টিউটন জাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামন্ততন্ত্রের মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি নিহিত ছিল যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতা, জুরী প্রথা, সম্পত্তির অধিকার। সামন্ত-প্রভুগণ নিরঙ্কুশ রাজশক্তিকে খর্ব করিয়া রাজার স্বেচ্ছাচারিতার পথরোধ করেন। ইংলণ্ডের অত্যাচারী রাজা জন সামন্ত প্রভুদের চাপে পড়িয়া ম্যাগ্‌না কার্টা বা মহাসনদ দান করিতে বাধ্য হন যাহাতে জনগণের অধিকার রক্ষিত হয়। এই প্রথার নৈতিক মূল্যও কম নয়। শিভাল্‌রী মানুষের চরিত্রের মহৎ অনুভূতিগুলি প্রকাশ করে।

সামন্ততন্ত্র একটি বিশেষ সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থামাত্রই নয়, ইহা ছিল একটি **জীবনধারা**। স্বাধীন অভিজাত শ্রেণী মুক্ত জীবন যাপন করিত। এই জীবন কাব্য, সাহিত্য ও রোমান্সের বিকাশে প্রেরণা দিয়াছিল। দুর্গের দ্বার ভবঘুরে গায়ক ও গল্পকারদের জন্য সর্বদাই খোলা থাকিত। প্রাসাদ-দুর্গের দীর্ঘ একঘেঁয়ে রাত্রিগুলি কখনো কখনো নাচ, গান ও অভিনয়ে মুখর হইয়া উঠিত। এই সব অনুষ্ঠান করিত ভ্রাম্যমাণ মিন্সট্রেল্‌গণ। রাত্রিবাসের স্থান এবং খাদ্য ও পানীয় পাইলেই তাহারা দুর্গবাসীদের আপ্যায়ন করিত। ট্রুবাডুরগণ (Troubadours) ছিলেন সামন্তযুগের চারণ কবি। কাব্য, গান, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া তখন দিন কাটিত। নাইটদের আনন্দময় জীবনধারার রূপ বিখ্যাত কবি চসারের একটি কবিতায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"গেয়ে গান বা বাজিয়ে বাঁশি কাটায় সারা দিন,
সেজন এমনি তাজা যে মাসের মতোই নবীন"।

(চসারের বিখ্যাত বই 'কাণ্ট্যারবেরি টেল্‌স'-এর একটি কবিতার বঙ্গানুবাদ)

ম্যানোরীয় প্রথা—গ্রামবাসীর কায়িক পরিশ্রমে জমি চাষের যে মধ্য-যুগীয় ব্যবস্থা ছিল তাহাই ম্যানোরীয় প্রথা (Manorial system)। এই

প্রথা সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক অঙ্গ ম্যানর (manor) বা খামার ছিল সামন্ততান্ত্রিক সরকারের শাসন-সংক্রান্ত স্থানীয় সংস্থা। এক একটি ম্যানরে একটি গ্রাম তো বটেই, অনেক সময় একাধিক গ্রামও থাকিত। এইখানে জমিদার রূপে লর্ড তাঁহার প্রজা-কৃষকদের উপর তাঁহার রাজনৈতিক ও সম্পত্তিগত অধিকার প্রয়োগ করিতেন। খামারে কৃষকদের কঠিন কায়িক শ্রম ও প্রচুর করদানের উপর আভিজাত্যমণ্ডিত সামন্তপ্রথার আর্থিক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী যুদ্ধে, শিকারে এবং দুর্গ ও গীর্জা নির্মাণ করিয়া আলস্যে সময় কাটাইতে পারিতেন, কারণ তাঁহাদের পিছনে ছিল জমিতে কৃষকদের শ্রমের সুনিশ্চিত আশ্বাস। কৃষকদের কর্ম ও ঘর্ম জমিদারদের অবসর বিনোদনের রসদ যোগাইত।

ম্যানোরীয় প্রথার বীজ রোমান ও জার্মান সমাজে দেখা যায়। রোমান সাম্রাজ্যের শেষদিকে ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী ও দাসরূপী কৃষক শ্রেণীর প্রথম উদয় হয়। কিছু ম্যানরের উৎপত্তি হইয়াছিল রোমান ভিলা (জমিদারী) হইতে, অপর ম্যানরগুলি উদ্ভূত হয় জমিদারের প্রভাবাধীন জার্মান গ্রাম্য সমাজ হইতে। রোমান ভিলার মালিক ছিলেন একজন পেট্রিশিয়ান, তাঁহার অনুচরেরা ও ক্রীতদাসগণ জমি চাষবাস করিত। জার্মান গ্রামে সাধারণভাবে জমির মালিকানা ও চাষের দায়িত্ব ছিল এক দল ফ্রিমেন বা স্বাধীন প্রজার উপর। এই দুই ধারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রোমান ভিলা জার্মান গ্রাম ও ফ্রিমেন গোষ্ঠীর দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং জার্মান গ্রামগুলি রোমানদের ব্যক্তিগত মালিকানার দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হয়। শহর হইতে গ্রামাঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ফলে এই ম্যানোরীয় প্রথার বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়, কারণ চার্চেরও ভূসম্পত্তি ছিল এবং সেখানে এই প্রথা প্রসারিত হয়। চার্চের প্যারিশ (Parish) ছিল মানবের সমতুল্য। মধ্যযুগের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এই প্রথাও রোমান, জার্মান ও খ্রীষ্টান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

এই বৈচিত্র্যময় উৎপত্তির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যানোরীয় প্রথা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। সর্বত্র এই প্রথার বিকাশ হয় নাই। পার্বত্য অঞ্চলে

কিংবা সমুদ্রতীরবর্তী স্থলে এই প্রথা সম্ভব ছিল না। সামন্ত প্রথার ন্যায় ম্যানোরীয় প্রথাও এক দেশ হইতে আরেক দেশে, এক খামার হইতে আরেক খামারে পৃথক রূপে বিকশিত হয়। একটি ইংরেজ খামারের বৈশিষ্ট্যগুলি নরম্যাণ্ডির খামারে অনুপস্থিত ছিল। তবুও বলা চলে যে সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে ম্যানোরীয় প্রথার বহুল প্রচলন ছিল এবং আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এই প্রথার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্যও দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের অবস্থা ও জীবনধারা অনেকাংশে একই রকমের ছিল। ইউরোপ হইতে এই ম্যানর আজও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই এবং সেখানে গ্রামাঞ্চলে এখনও খামার বাড়ী দেখা যায়।

কৃষকদের অবস্থা—সেকালে জনসংখ্যার বেশীর ভাগই ছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ছোট ও বড় জমিদারগণ ছিলেন জনসংখ্যার শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ, কি তাহারও কম। বাদবাকী বিশাল অংশ ছিল কৃষকেরা। কৃষকেরা দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—স্বাধীন কৃষক ও সার্ফ। স্বাধীন কৃষকদের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণী সেবা ও করদানের সর্তে জমি লইত এবং সেই সব কর দিত যাহা সার্ফদের নিকট হইতেও আদায় করা হইত। অপর শ্রেণীকে বলা হইত স্বাধীন ভিলেন; তাহারা খাজনা দিয়া জমি গ্রহণ করিত ও গ্রামের সার্ফদের ন্যায় জমিদারের খাস জমিতে চাষও করিত।

জনসংখ্যার সুবিশাল অংশ ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস। স্বাধীন কৃষকদের যে সামান্য স্বাধীনতা ছিল সার্ফদের তাহাও ছিল না। সার্ফপ্রথা ছিল বংশানুক্রমিক। সুতরাং সার্ফ হইয়াই তাহারা জন্মাইত। কোন পুরুষ সার্ফের সহিত যদি স্বাধীন নারীর বিবাহ হইত তাহা হইলে উভয়ের সন্তানাদি সার্ফ বলিয়া গণ্য হইত। সার্ফরা ছিল প্রায় রোমান ক্রীতদাসদের মতই। আইনত সার্ফ ছিল প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে কোন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত না। কার্যক্ষেত্রে তাহাকেও ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রয় করা হইত কখনো বা একটি ভালো ঘোড়ার দামের চেয়েও অল্প মূল্যে। আইন তাহাকে একটি অধিকার দান করিয়াছিল—সে আদালতে অপর

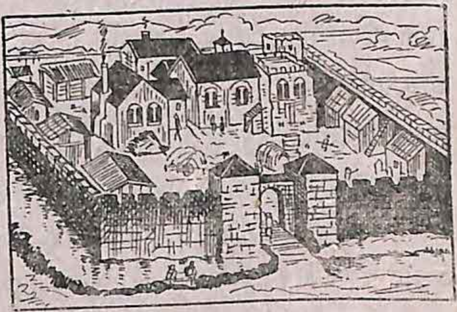
সার্ফের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিত, কিন্তু একজন স্বাধীন নাগরিক বা লর্ডের বিরুদ্ধে নয়। তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে কিছুই ছিল না। প্রভুর একখণ্ড জমিতে সে বাস করিত কিন্তু জমির উপর আইনত কোন অধিকার তাহার ছিল না। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাইবার স্বাধীনতা তাহার ছিল না। সে স্বেচ্ছায় এক খামার বাড়ী হইতে অন্যত্র যাইতে পারিত না, গ্রাম হইতে শহরেও নয়। কখনো তাহা করিলে লর্ডের তাহাকে তাড়া করিবার অধিকার ছিল। এইভাবে সার্ফের জীবন তাহার চাষের জমির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল। লর্ডের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করিবার অধিকারও সার্ফের ছিল না। **জমি চাষ ও করদান** ছিল তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক।

সার্ফদের প্রভুকে বহু প্রকারের কর দিতে হইত। ফিউডাল নীতি অনুসারে লর্ড নিজ ইচ্ছামত সার্ফদের উপর যে কোন রকমের কর ধার্য করিতে পারিতেন। কিন্তু নিজের খেয়াল খুশিমত যথেচ্ছ কম বসাইয়া কৃষককুলকে অসন্তুষ্ট করা তাঁহার পক্ষেই বিপজ্জনক ইহা লর্ড জানিতেন। কার্যক্ষেত্রে সার্ফদের অর্থে ও প্রকারে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর লর্ডকে দিতে হইত। বিবাহের জন্য সার্ফকে লর্ডের অনুমতি আদায় করিতে হইত ও সেই জন্য কর দিতে হইত। ক্যাপিটেশান ছিল সাধারণ বার্ষিক কর। কয়েক পেন্স অর্থ কিংবা অনেক পাউণ্ড মাখন বা মোম ছিল এই করের পরিমাণ। টেইল (taille) প্রথমে ছিল ব্যক্তিগত কর, কিন্তু পরে ইহা সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ করে পরিণত হয়। ভূস্বামীদের রিলিফ-এর ন্যায় সার্ফদের উত্তরাধিকার লাভের কর ছিল হেরিয়ট (heriot)। চার্চকে তাহাদের ধর্মকর (tithe) দিতে হইত। ইহা ছাড়া খামারে লর্ডের সম্পত্তির কিছু অংশ যেমন কল, চুল্লী, কূপ ইত্যাদি ভোগ করার জন্য তিনি সার্ফদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন। রাস্তা ও সেতু ব্যবহার করার জন্য লর্ড টোল (toll) আদায় করিতেন। এই সকল করের মধ্যেও আঞ্চলিক পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ছিল। এই দুর্বহ করের বোঝা এইভাবে দরিদ্র কৃষকদের বহন করিতে হইত।

একটি সাধারণ খামারে ৯০০ হইতে ২,০০০ একর পর্যন্ত চাষের উপযোগী

জমি থাকিত। এই জমি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগের জমিতে শরৎকালে গম ও সরিষার বীজ বপন করা হইত এবং পরবর্তী গ্রীষ্মের প্রথমদিকে সেই ফসল ফলিত। দ্বিতীয় ভাগের জমিতে বসন্তকালে বার্লি, যব, কড়াইশুঁটি, সরিয়া প্রভৃতির বীজ বপন করা হইত ও তাহার ফসল ফলিত পরবর্তী গ্রীষ্মের শেষ দিকে। তৃতীয় ভাগের জমি তখন পড়িয়া থাকিত। সেখানে এক বৎসর পরে চাষাবাদ হইত। তখন অন্য ভাগের জমি ফেলিয়া রাখা হইত। এইভাবে চক্রাকারে চাষ চলিত। জমিগুলি খোলা অবস্থায় থাকিত, বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত না। জমি **চাষ হইত** গ্রামের চাষীদের **যৌথ প্রয়াসে**, একক প্রচেষ্টায় নয়।

ম্যানর হাউস—লর্ড তাঁহার জমিদারীতে যে অট্টালিকা নির্মাণ করিতেন তাহাই 'ম্যানর হাউস' বা খামার বাড়ী। তিনি অনেক সময় দুর্গ অপেক্ষা এইখানে থাকা পছন্দ করিতেন। এই বাড়ী ছিল ম্যানরের শাসনকেন্দ্র। গ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে ইহা অবস্থিত থাকিত। ইহা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। এই ত্রিতল অট্টালিকা ধন ও ঐশ্বর্যে ঝালমল করিত। এক তলাতে লর্ডের বিলাসময় শয়নকক্ষ ও দরবার কক্ষ থাকিত। এখানেও আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল না। কাঁচের জানালা ছিল বিরল। দুর্গের জীবনধারার অনুরূপ ছিল ম্যানর হাউসের জীবনধারা।



ম্যানর হাউস

ম্যানরগুলির **নিজস্ব আদালত** ছিল। গ্রামবাসীকে সেখানে হাজির থাকিতে হইত। আদালত বসিত গীর্জার প্যারিশ-গৃহে কিংবা খামার বাড়ীর হল-ঘরে। অনেক সময় বাহিরে বড় গাছের তলায়ও আদালত বসিত। এখানে জমিদার ও গ্রামবাসী তাহাদের অধিকার রক্ষা করিতেন এবং গ্রামের সামাজিক রীতিনীতি নির্ধারিত হইত। জরিমানায় যে অর্থ

এখানে সংগ্রহ করা হইত তাহা জমিদার গ্রাস করিতেন এবং এই অর্থ তাঁহার আয়ের একটি বড় উৎস ছিল।

মধ্যযুগে সমাজ তিনটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—যাজক শ্রেণী, **অভিজাত** শ্রেণী বা ভূস্বামী সম্প্রদায় এবং **সাধারণ** মানুষ বা তৃতীয় শ্রেণী। কৃষকেরা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাজক ও অভিজাত শ্রেণী সমাজের সকল অধিকার ভোগ করিত। তৃতীয় শ্রেণী সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। অভিজাত শ্রেণী কৃষকদের শোষণ করিত। উভয়ের সম্পর্ক ছিল খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক।

সার্ফদের মুক্তিসংগ্রাম—দরিদ্র কৃষকদের কুঁড়েঘর ছিল ঐশ্বর্যময় খামার বাড়ীর বিপরীত ছবি। ঐ কুঁড়েঘরের মেজে ছিল মাটির, মাথায় খড়ের চালা। উহার জানালা বলিতে কিছুই ছিল না। ছাদে একটি গর্ত থাকিত যাহার মধ্য দিয়া ধোঁয়া বাহির হইত। ঘরগুলি ছিল অন্ধকার। আসবাব ছিল না বলিলেই হয়। শুকনো গাছের পাতা কিংবা খড় দিয়া বিছানো মাদুরের বিছানায় তাহারা শয়ন করিত। বহু প্রকারের কর দিয়া যেটুকু অর্থ তাহাদের থাকিত তাহাতে কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। যে খাদ্য তাহারা পাইত তাহাতে কোন রকমে তাহাদের প্রয়োজন মিটিত। তাহাদের জীবন ছিল বৈচিত্র্যহীন ও নিরানন্দময়। দারিদ্র্য পরাধীনতা ও করভারে জর্জরিত কৃষকদের এই যে বন্দী জীবনধারা তাহারই নাম ম্যানোরীয় প্রথা; সামন্ত প্রভুদের আনন্দমুখর মুক্ত জীবনধারা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। সেইজন্য সার্ফরা বার বার বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। **শহরে পলায়নই** ছিল তাহাদের মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়। তাই শহর তাহাদের আকর্ষণ করিত। একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ইউরোপে যে নূতন শহরগুলির অভ্যুদয় হয় তাহাদের মুক্ত পরিবেশ এবং সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে চাকুরির সুযোগ সার্ফদের প্রলোভিত করিত। তাহারা জানিত একবার শহরে পৌঁছাইলে আর তাহারা সার্ফ থাকিবে না। কোন নূতন বসতি গড়িয়া উঠিলে তাহা তাহাদের আকৃষ্ট করিত। কখনো সমগ্র গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত।

কোন কোন ক্ষেত্রে শহরের দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণায় কতকগুলি গ্রাম সংঘবদ্ধ হইয়া জমিদারদের নিকট হইতে স্বাধীনতার সনদ আদায় করিয়া লইত। অসংখ্য সার্ফ মুক্তির সন্ধানে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। মধ্যযুগের শেষ ভাগে ইউরোপে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও অভিজাততন্ত্রের অবক্ষয়ের সুযোগ লইয়া সার্ফরা নিজেদের মুক্তির প্রচেষ্টা জোরদার করে। জমিদারগণ তখন সার্ফদের নিজ আয়ত্তে রাখিবার জন্য তাহাদের বাধ্যতামূলক শ্রম হইতে মুক্তি দিতে শুরু করেন। সার্ফদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘ। এই সংগ্রামের নায়ক তাহারাই এবং তাহাদের মুক্তিলাভ শুধু মধ্যযুগের নয়, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা।

অষ্টম অধ্যায় | ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কাহিনী

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট আন্দোলন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, এশিয়া ও ইউরোপ এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের সংঘাত এই ক্রুসেড। ঐতিহাসিক মায়ার্স (Myers)-এর মতে, ক্রুসেড ছিল মুসলমানদের কবল হইতে প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানগুলি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ইউরোপের খ্রীষ্টানদের সামরিক অভিযান। প্যালেস্টাইনের



ধর্মযোদ্ধা

জেরুসালেম শহরে যীশুখ্রীষ্টের সমাধি অবস্থিত। এই পবিত্র স্থানটি মুসলমানদের অধিকারে থাকায় খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা নানা অসুবিধা ও লাঞ্ছনার

সম্মুখীন হইত। তাই যীশুর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র ভূমিকে বিধর্মীদের হাত হইতে উদ্ধারকল্পে খ্রীষ্টানরা যুদ্ধযাত্রা করেন। এই ধর্মযুদ্ধে যাওয়ার পথে ও যুদ্ধশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহারা ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিতেন। 'ক্রুশ' শব্দটি হইতে ক্রুসেড (Crusade) কথাটি আসিয়াছে। ঐতিহাসিকরা আটটি যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি যুদ্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্মযুদ্ধের কারণ—ধর্মযুদ্ধের পশ্চাতে বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়া ছিল। **ধর্মীয় উদ্দীপনা** ধর্মযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রভু যীশুর স্পর্শে পূত স্থানগুলি ভ্রমণ করা খ্রীষ্টানগণ চিরদিনই পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করিতেন। এই পবিত্র তীর্থযাত্রায় অতীতের পাপ স্খালন হয় এমন ধারণা তখন প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে এই তীর্থযাত্রা নিরাপদ ছিল। আরবগণ সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহারা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের সামনে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে সেল্‌জুক তুর্কীরা এশিয়া মাইনর, অ্যান্টিওক ও সিরিয়া দখল করিয়া কন্‌স্টান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জেরুসালেম অধিকার করে। তখন হইতে খ্রীষ্টানদের তীর্থযাত্রা বিঘ্নিত হয়। তীর্থস্থানে গমন যদি পবিত্র কাজ বলিয়া গণ্য হয় তবে সেই স্থান বিধর্মীদের গ্রাস হইতে উদ্ধার আরো অনেক বেশী কৃতিত্বপূর্ণ ও পুণ্যকর্ম। ধর্মান্ধ তুর্কীদের খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার কিছুটা বা অতিরঞ্জিত হইয়া ইউরোপে পৌঁছাইলে সেখানে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পোপ খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ঘা দিয়া এই উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি করেন। ফলে ধর্মযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে।

মহম্মদের মৃত্যুর পর ইস্‌লাম ধর্ম আফ্রিকার উত্তর উপকূলে প্রসার লাভ করে এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হয়। পশ্চিমের দিকে ইস্‌লামের অগ্রগতি রোধ করিবার প্রয়াসেই পশ্চিমী রাজারা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ধর্মযুদ্ধ মুসলমান ধর্ম প্রসারের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতিরোধ।

ধর্মচেতনা ব্যতীত ধর্মযুদ্ধের অন্যান্য কারণও ছিল। যুদ্ধপ্রিয় বর্বর

জাতিগুলির সংস্পর্শের ফলে ও আক্রমণাত্মক ইস্‌লাম ধর্মের প্রভাবে পশ্চিমী চার্চের মধ্যে এক যুদ্ধবাজ মনোভাব দেখা দেয়। এই মনোভাবের এক প্রতিকলন দেখা যায় শিভাল্‌রী প্রথার মধ্যে, অপরটি ক্রুসেডে। শিভাল্‌রী ধর্মযুদ্ধে প্রেরণা দেয়, তাই ইহাকে 'ক্রুসেডের পিতা' বলা হয়। চার্চ এই সময় জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহার ফলে সামন্ত প্রভুগণ জমিজমা চার্চের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিয়াছিলেন। নর্মানদের ইংলণ্ড ও সিসিলি বিজয় পশ্চিম ইউরোপে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সমগ্র একাদশ শতাব্দীতে নর্মানরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের তীব্র পারস্পরিক বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলে। অনেকে নিছক পরিবর্তন ও নূতনত্বের সন্ধানে এই অভিযানে যোগদান করে। অনেক সার্ফ দৈনন্দিন দারিদ্র্য ও বঞ্চনা হইতে মুক্তির আশায় এই যুদ্ধে যোগ দেয়। ইটালীর উদীয়মান নগরগুলি ও নর্মানগণ ভূমধ্যসাগরের মধ্যভাগ হইতে মুসলমান জলদস্যুদের জাহাজগুলি হটাইয়া দিয়া জলপথে প্যালেস্টাইন যাত্রার পথ সুগম করে। সেল্‌জুক তুর্কীদের সাম্রাজ্য ধর্মযুদ্ধের ঠিক পূর্বেই ভাঙিয়া পড়ে। ইহার সহিত তুর্কী ও আরবদের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা মুসলমান জগতের শক্তি হ্রাস করে। ইহা খ্রীষ্টানদের সহায়ক হয়।

এই ধর্মযুদ্ধের পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও ছিল। পশ্চিমী দেশগুলি **ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের প্রয়োজন** অনুভব করে। ইটালীর নগররাষ্ট্রগুলির ব্যবসায়ীরা ধর্মযুদ্ধকে সমর্থন করেন কারণ তাঁহারা দেখিলেন ইহাতে ইটালীর জাহাজের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং 'পবিত্র ভূমি'তে তাঁহাদের বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। তুর্কীরা ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত। ইটালীর বণিকরা তুর্কীদের বিতাড়িত করিয়া ঐ অঞ্চলকে মুক্ত করিবার জন্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। ইউরোপের **খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ** ও লোভ ক্রুসেডের অন্যতম কারণ। অর্থ, সম্পদ ও নূতন ভূখণ্ডের লোভে ইহারা লালায়িত হন। কোন কোন রাজা বাইজেণ্টাইন

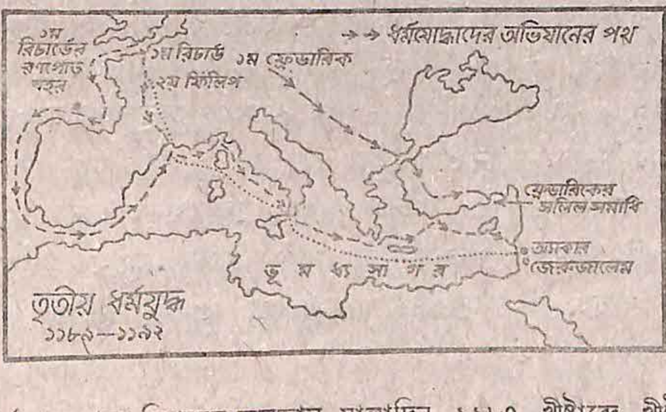
সাম্রাজ্যকে বশীভূত করিবার স্বপ্ন দেখেন। অভিজাতবর্গ প্রাচ্যে মূল্যবান ভূসম্পত্তি লাভের আশা পোষণ করেন। রোমান পোপের উদ্দেশ্যও রাজনৈতিক বাসনার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে পোপ চার্চের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন। বাইজেণ্টাইনের গ্রীক চার্চ পোপের আধিপত্য মানিত না। পোপ এখন বাইজেণ্টাইন চার্চের উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেন। নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীনে সমগ্র খ্রীষ্টান জগৎকে আনয়ন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। খ্রীষ্টান রাজারা তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ক্রুসেডের জন্য যে ধর্মীয় উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল পোপ তাহা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইয়াছিলেন। কেবল বিধর্মীদের নয়, তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রুদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে প্ররোচিত করেন। এই সকল কারণে ধর্মযুদ্ধ ছিল আদর্শগত প্রেরণা ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির, জনগণের ধর্মীয় উদ্দীপনা ও রাজন্যবর্গের বাস্তবমুখী রাজনীতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ধর্মযুদ্ধকে 'পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রসারের এক অধ্যায়' বলা হইয়া থাকে।

কথিত আছে পিটার নামক এক ফরাসী সন্ন্যাসী প্যালেস্টাইনে গিয়া স্বচক্ষে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের দুর্দশা এবং তুর্কীদের হাতে তাহাদের নিগ্রহ দেখেন। তাহার পর ইউরোপের খ্রীষ্টান জনগণের উদ্দেশ্যে জেরুসালেমের পেট্রিয়ার্কের চিঠি লইয়া তিনি খালি পায়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া যীশুর নামে জনগণকে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রীষ্টান জনসাধারণ তাঁহার প্রচারে উত্তেজিত হইয়া দলে দলে তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইল। শেষ পর্যন্ত রোমে গিয়া পিটার পোপ দ্বিতীয় আর্বানের পদতলে নিজেকে নিবেদিত করিয়া 'পবিত্র ভূমি'র মুক্তির জন্য ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

বাইজেণ্টাইন সম্রাট তুর্কী-আক্রমণের চাপে পড়িয়া পোপের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পোপ তখন ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ক্লার্মণ্টে ধর্মসভা আহ্বান করেন। ধর্মসভায় বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয়। পোপ আর্বান জ্বালাময়ী ভাষায় সভাস্থ সকলকে ক্রুশ গ্রহণ করিয়া বীর বিক্রমে বিধর্মী-

দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করেন। পোপের হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পর সমবেত জনতা উত্তেজনায় অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে—'ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়'। এই ধ্বনিই ছিল ধর্মযুদ্ধের মন্ত্র। ইহার পর তাহারা ছুটিয়া গিয়া বক্ষে ক্রশ-চিহ্ন ধারণ করিল। এইভাবে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। একাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই ধর্মযুদ্ধ চলে দফায় দফায়।

ধর্মযুদ্ধের অভিযান—প্রথম ধর্মযোদ্ধা-বাহিনী যাত্রা করে ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা ছিল যুদ্ধে অপটু অশিক্ষিত কৃষক বাহিনী। ইহারা সহজেই পরাজিত হয়। **প্রথম ক্রুসেডে** পশ্চিমের কোন বিখ্যাত নৃপতি, যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর রাজা, পোপের ডাকে সাড়া দেন নাই। ফরাসী নোব্‌ল ও নাইটগণই নেতৃত্ব দেন। এই নেতাদের মধ্যেও মত ও পথের পার্থক্য ছিল। তবু প্রথম ক্রুসেডে খ্রীষ্টানগণ সিরিয়া, অ্যান্টিওক ও জেরুসালেম দখল করে। জেনোয়ার নৌবাহিনীর সহায়তায় ধর্মযোদ্ধাগণ ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম অধিকার করিতে সক্ষম হয়। এইভাবে এশিয়া মাইনরের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করিয়া ধর্মযোদ্ধারা জেরুসালেমে ল্যাটিন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্স ও জার্মানীর যুগ্ম নেতৃত্বে দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযান ব্যর্থ হয়।



দীর্ঘকাল বাদে মিশরের সুলতান সালাদিন ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টানদের হাত হইতে জেরুসালেম দখল করেন। ইহার ফলে তৃতীয় ক্রুসেডের

প্রয়োজন হইল। এই তৃতীয় ক্রুসেডের নায়ক ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা 'সিংহ-হৃদয়' রিচার্ড, জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা ও ফরাসীরাজ ফিলিপ অগাস্টাস। ঐক্যবদ্ধ অভিযানের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ফ্রেডারিক বার্বারোসা হাঙ্গেরীর মধ্য দিয়া স্থলপথে তাঁহার জার্মান বাহিনীকে লইয়া জেরুসালেমের দিকে যাত্রা করিলেন। বহু কষ্টে জার্মান বাহিনী এশিয়া মাইনরে পৌঁছিল। সম্রাট ফ্রেডারিক সিলিসিয়াতে নদী পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মারা গেলেন। ইংলণ্ডরাজ রিচার্ড ফরাসীরাজ ফিলিপের সহিত জলপথে জেরুসালেমের নিকটবর্তী হইলেন। কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক মধুর না থাকায় তাঁহারা কেবলই বিবাদে লিপ্ত থাকেন। দীর্ঘ দুই বৎসর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহারা জেরুসালেম অধিকার করিতে পারিলেন না। ফিলিপ অজুহাত দেখাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শেষ পর্যন্ত রিচার্ড একক বীরত্বের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সালাদিনের সহিত তিন বৎসরের জন্য সন্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী খ্রীষ্টানদের জেরুসালেম ভ্রমণের সকল বাধা অপসারিত হইল।

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট নিজ শক্তি বৃদ্ধি ও বাইজেণ্টাইনে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চতুর্থ ক্রুসেড আহ্বান করেন। ভেনিস এই ক্রুসেডে যোগদান করে এবং জলপথে যাত্রা শুরু হয়। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন হয় এবং পরের বৎসর ঐ নগরী লুণ্ঠিত হয়। সৈন্যগণ মূর্তিগুলি পদদলিত করে, দুর্লভ অলঙ্কার ও বাসন লুঠ করে। সান্টাসোফিয়ার পবিত্র বেদী চূর্ণ করিয়া মূল্যবান প্রস্তরগুলি অপহরণ করা হইল। লুণ্ঠিত সামগ্রী বহনের জন্য ঘোড়া ও খচ্চর ব্যবহার করা হয়। শিল্পকলার অমূল্য নিদর্শনগুলি বিনষ্ট করা হয়। অশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী এইভাবে ধ্বংসের নেশায় মাতিয়া উঠে। কিন্তু কন্‌স্টান্টিনোপলের এই নূতন ল্যাটিন সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। চতুর্থ ক্রুসেডে পাপকার্যের অপযশ সত্ত্বেও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যকেন্দ্র প্রাচ্য হইতে ভেনিসে স্থানান্তরিত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রায় ত্রিশ হাজার বালক-বালিকা ক্রুসেড অভিযান করে। দুঃখজনক ভাবেই ইহা ব্যর্থ

হয়। অসংখ্য **শিশুর** মৃত্যু ঘটে, অনেককে দাসরূপে বিক্রয় করা হয়। **পঞ্চম** ক্রুসেডও ব্যর্থতা বরণ করে। **ষষ্ঠ** ক্রুসেডের নায়ক ছিলেন জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। মিশরের সুলতান আল্ কামিল ফ্রেডারিকের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া এক চুক্তির দ্বারা জেরুসালেমের অধিকার তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এইভাবে বিনা যুদ্ধে জেরুসালেম উদ্ধার হয় (১২২৯ খ্রীঃ)। দীর্ঘ দিন পরে ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ আবার জেরুসালেম দখল করিলে ফরাসীরাজ সেণ্ট লুইস্ **সপ্তম** ক্রুসেড অভিযান করেন। সপ্তম ও **অষ্টম** ক্রুসেডেও জেরুসালেম উদ্ধার সম্ভব হয় নাই।

ধর্মযুদ্ধের ফলাফল—ধর্মযুদ্ধের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় **পশ্চিমী সভ্যতা উৎকর্ষের চরম শিখরে** আরোহণ করে। একদল পণ্ডিতের মতে, ক্রুসেডের ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। রাজশক্তির প্রসার, শহরের অভ্যুদয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, সাংস্কৃতিক নবজাগরণ এই সবই ক্রুসেডের ফলশ্রুতি। আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য মনে করেন ক্রুসেডের ফলেই এই সব পরিবর্তন ঘটে এ কথা বলা সঙ্গত নয়। এই সকল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল, ক্রুসেড তাহাদের ত্বরান্বিত করে।

ধর্মযুদ্ধের ফলে **অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয় ও শক্তিশালী রাজতন্ত্রের বিকাশ** ঘটে। অনেক সামন্তপ্রভু এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহাদের ভূসম্পত্তি রাজা বাজেয়াপ্ত করিয়া নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। অনেক জমিদার তাঁহাদের জমিজমা বিক্রয় করিয়া কিংবা বন্ধক রাখিয়া প্রাপ্ত অর্থ এই যুদ্ধে ক্ষয় করেন। ইহার ফলে তাঁহাদের শক্তি ও সম্পদ হ্রাস পায়। অভিজাততন্ত্রের দুর্বলতায় কেন্দ্রীভূত জাতীয় রাজতন্ত্রের উত্থান সম্ভব হয়।

ধর্মযুদ্ধ **পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি** করে। পোপের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় এই যুদ্ধ সংগঠিত হইয়াছিল। ফলে পোপের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই যুদ্ধে চার্চ প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়। ক্রুসেডের

প্রয়োজনে যাজকদের উপর ধর্মকর ধার্য করিয়া পোপগণ তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি করেন।

ক্রুসেডের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও **ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার** হয়। **ইটালীর শহরগুলি বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে।** বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অনেক সার্ফ এই যুদ্ধে যোগ দিয়া মুক্তি লাভ করে। **কুটীরশিল্পের** প্রসার হয় ও এই শিল্প কৃষি হইতে পৃথক হইয়া **স্বতন্ত্ররূপে বিকশিত** হয়। অনেক সার্ফ এই শিল্পে যোগদান করে। ইটালীর ব্যাঙ্কগুলির শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রাচ্য হইতে প্রচুর সোনা এবং রেশম, কার্পেট, মশলা, রঙ, সেন্ট প্রভৃতি পণ্য ও বিলাস দ্রব্যের আমদানী হয়। এইসব কারণে অর্থনৈতিক বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

ক্রুসেডের ফলে মুসলমানদের উন্নত ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত ইউরোপবাসীর পরিচয় ঘটে। **স্বাধীন** ও সমালোচনাধর্মী **চিন্তাধারার বিকাশ** হয়। ইহারই ফলে পরবর্তীকালে রেনেসাঁস আত্মপ্রকাশ করে। ক্রুসেড সমগ্র ইউরোপবাসীদের এক পতাকাতলে আনিয়া ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং ইউরোপের মানসিক জড়ত্ব ভাঙিয়া উহার মধ্যে নূতন প্রাণচেতনা সঞ্চার করে।

নবম অধ্যায়

শহরের অভ্যুদয়

বর্বর জাতির আক্রমণে প্রাচীন ইউরোপের সুন্দর শহরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রোমানরা ছিল এই শহরগুলির নির্মাতা। বর্বর জাতিগুলি মুক্ত গ্রাম্য জীবন পছন্দ করিত। তাই মধ্যযুগের প্রথমভাগে ইউরোপের মানুষ নাগরিক জীবন ত্যাগ করিয়া পল্লী-জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিল। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের জনজীবন ছিল প্রধানতঃ গ্রামীণ। কিন্তু পরবর্তী-কালে আবার নাগরিক জীবনের বিকাশ হয়।

শহরের উত্থানের কারণ—শার্লমেনের মৃত্যুর পর পশ্চিম ইউরোপে আবার বর্বর-আক্রমণের স্রোত নামে। এই অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে লোকে প্রাচীরঘেরা স্থানে বাস করিতে শুরু করে। মজবুত দেওয়াল ছিল তখন একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। এই **প্রাচীরঘেরা** স্থানগুলি হইতে শহরের উৎপত্তি হয়। এই সময় সামন্ত-প্রথার উদ্ভব হয়। সামন্তপ্রভুগণ একই প্রয়োজনে নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ করেন। এই সকল **দুর্গকে** কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে শহর গড়িয়া উঠে। এই দুর্গগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুবিশাল প্রস্তরনির্মিত সৌধ নয়। প্রথম দিকে এইগুলি ছিল কাষ্ঠনির্মিত, হঠাৎ কোন সঙ্কট দেখা দিলে তাড়াহুড়া করিয়া ইহাদের নির্মাণ করা হইত। তৎকালীন নথিপত্রে ইহাদের বলা হইত **বার্গ** (burg), যাহার প্রকৃত অর্থ ঠিক দুর্গ নয়, একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থান। এই স্থানে কারিগর, ব্যবসায়ী ও বণিকেরা আসিয়া জমায়েত হইত। ইহাদের বলা হইত **বার্জেস** (burgess)। এই শব্দটি হইতেই **বুর্জোয়া** (bourgeois) কথাটি আসিয়াছে। বুর্জোয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী শহরেই জন্মলাভ করে। মধ্যযুগে **মঠগুলির** সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই মঠগুলি সুরক্ষিত থাকায় বিপদের সময় তাহারাও মানুষের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ায়। মঠগুলিকে কেন্দ্র করিয়া কিছু শহর গড়িয়া উঠে।

শহরগুলির উত্থানের একটি প্রধান কারণ **শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার**। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের ফলে মানুষের আর্থিক সংগতি বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধা ক্রমশই তাহাকে আকর্ষণ করে। কৃষকেরাও গ্রামের জমিদারের অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার লাভের আশায় শহরে পলাইয়া আসে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে শহরগুলি যত সমৃদ্ধ হয় ততই তাহারা ফিউডাল লর্ডদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। শহরগুলিও সামন্তপ্রথার অংশীদার হইয়াছিল। শহরগুলি ভ্যাসাল এবং বিভিন্ন লর্ডের অধীনে ছিল, সেই লর্ড রাজা, সম্রাট বা জমিদার যেই হউন না কেন। কিন্তু ক্রমশই শহরগুলির আর্থিক সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া লর্ডগণ তাঁহাদের অর্থের দাবি বাড়াইয়া দিতে

লাগিলেন। শহরগুলি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করিল এবং দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে লর্ডদের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিল।

শহরের উত্থানে **ক্রুসেডের অবদান** অনস্বীকার্য। ধর্মযুদ্ধের ফলে শহরগুলি অভিজাত ও রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অনেক রাজনৈতিক অধিকার আদায় করিয়া লয়। বহু সামন্তপ্রভু ধর্মযুদ্ধে যাত্রার উদ্দেশ্যে শহরগুলির নিকট হইতে টাকা ধার করেন। ইহার পরিবর্তে শহরগুলি তাঁহাদের মূল্যবান সনদ দান করিতে বাধ্য করে। এই সনদের ফলে তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করে। ধর্মযুদ্ধের ফলে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয় তাহাতে শহরগুলি, বিশেষ করিয়া ইটালীর নগর-রাষ্ট্রগুলি, সবিশেষ লাভবান হয়। সুতরাং একদিকে অভিজাত শ্রেণী যেমন শক্তিহীন ও সম্পদহারা হইয়া পড়ে, অন্যদিকে শহরগুলি শক্তি ও সম্পদে বলীয়ান হইয়া উঠে।

গীল্ড—শহরগুলিতে আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত এক একটি সমিতি যাহার নাম গীল্ড। বণিক ও কারিগরগণ পৃথক পৃথক গীল্ড গঠন করিয়া ব্যবসা পরিচালনা করিতেন। এই সকল সমিতি নিজেদের নিয়মকানুন রচনা করিত এবং সমিতির সকল বণিক ও শিল্পীকে এই নিয়ম মানিতে হইত। স্থানীয় বাজারের সংরক্ষণ ও বহিরাগত ব্যবসায়ীকে ঐ বাজারে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই ছিল গীল্ডের উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া পেশার মান উন্নয়ন এবং সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানও ইহার লক্ষ্য ছিল। বণিক ও শিল্পপতিগণ শহরের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি হইয়া উঠেন। স্বায়ত্তশাসন লাভের ফলে শহরের শাসনকার্য তাঁহারাই পরিচালনা করিতেন।

শহরের জীবনযাত্রা—শহরগুলি গড়িয়া উঠিত উচু ঢিলার উপর এবং সেইখানে অভিজাতদের প্রাসাদ গম্বুজের ন্যায় শোভা পাইত। শহরগুলি ছিল প্রাচীরবেষ্টিত। শহরের একটি সুদৃঢ় প্রবেশদ্বার থাকিত, যুদ্ধবিগ্রহের সময় যাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করা যাইত। কুটীর ও পণ্যশালাগুলিতে খড়ের বা টালির ছাউনি দেওয়া থাকিত। শহরের রাস্তাগুলি ছিল সরু ও আঁকাবাঁকা। শহরের নানা স্থানে সরাইখানা থাকিত। ফেরিওয়ালারা পথে পথে পণ্য ফেরি করত। উৎসব-পার্বণে পথে জমকালো

শোভাযাত্রা বাহির হইত। শহরের মধ্যস্থলে থাকিত বাজার যাহার মাঝখানে একটি জলের ফোয়ারা থাকিত। দোকান-বাজার মানুষের কলরবে মুখরিত হইয়া থাকিত। রাত্রে নগররক্ষীরা পথে পথে পাহারা দিত। দস্যু-তস্করের উপদ্রব তখন কম ছিল না।



মধ্যযুগের শহর

মধ্য যুগের শহরগুলির মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল। ইটালীর শহরগুলিই ক্ষমতায় ও প্রভাবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহারা স্বায়ত্ত-শাসিত নগররাষ্ট্রে পরিণত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর, মধ্য ইটালীতে দুই শত নগররাষ্ট্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, পিসা, ভেরোনা, মিলান প্রভৃতি বিশেষভাবে খ্যাত। ফ্লোরেন্সে অনেক বিখ্যাত কবি, শিল্পী, ভাস্কর ও রাজনীতিজ্ঞ আবির্ভূত হন। ইহাদের মধ্যে পেট্রার্ক, দান্তে, মেকিয়াভেলি, মিকায়েল এ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দোদা-ভিঞ্চি, বোকাসিও ও মেদিচি পরিবারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মনীষী-সমাবেশের দিক হইতে ফ্লোরেন্স একমাত্র প্রাচীন এথেন্সের সহিতই তুলনীয়। ফ্রান্স, ইংলণ্ড জার্মানীতেও শহরের উত্থান হয়। লণ্ডন, ইয়র্ক প্যারিস, তুলোঁ, জুরিক, মিউনিক, ভিয়েনা, লিপ্‌জিগ্‌, হামবুর্গ, লুবেক প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখযোগ্য।

সভ্যতায় শহরগুলির দান—মধ্যযুগের তিনটি প্রাণকেন্দ্র ছিল দুর্গ, মঠ ও শহর। শহরগুলি নূতন অর্থনৈতিক আদর্শ ও নীতির জন্ম দেয়। এই শহরের বুকেই শ্রমিকরা সর্বপ্রথম মুক্তিলাভ করে এবং দাসপ্রথা ও সার্ফপ্রথার কলঙ্ক অপসারিত হয়। শহরগুলি বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় ও

অর্থনৈতিক বিপ্লব আনয়ন করে। ইহারা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অঙ্কনশিল্পকে পালন করে। শহরগুলিকে বর্তমান রাজনৈতিক মুক্তির জন্মস্থান বলা



যাইতে পারে। ইহারা বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দেয়, যে শ্রেণী উত্তরকালে ইউরোপের ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করে। ইটালীর শহরগুলি রেনেসাঁসের পথিকৃৎ।

মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য

সপ্তম ও চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী সময়ে চীন

হান্ বংশের সময়ে চীনে সাম্রাজ্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ ও প্রসার লাভ করে। হান্ রাজাদের পতনের পরে চীনে দেখা দেয় রাজনৈতিক অনৈক্য ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ। প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া এইরূপ অবস্থা চলে।

তাং (Tang) যুগ (৬১৮—৯০৭ খ্রীঃ)

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনে তাং নামে এক প্রতাপশালী রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। তাং বংশের প্রকৃত স্রষ্টা হইলেন **তাই সুং** (Tai Tsung), তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। এই সময়ে ওয়ে (Wei) উপত্যকায় চাং-আন্ (Ch'ang-an) নামক স্থানে চীনের জনবহুল ও সুন্দর রাজধানী স্থাপিত হয়। **মিং হুয়াং**-এর (Ming Huang) রাজত্বকালে (৭১২-৭৫৬) তাং বংশের গৌরব ও শক্তি চরম শিখরে আরোহণ করে। এই সময় সাম্রাজ্যের সীমা চরম বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেষ্ঠ কবি ও চিত্রকরের আবির্ভাব ঘটে। তাং-শাসিত চীনের মহিমা সমগ্র দূর প্রাচ্যে চমক্ সৃষ্টি করায় চৈনিক সভ্যতা জাপানে প্রসার লাভ করে। তাং সাম্রাজ্যের তুলনায় শার্লমেনের সাম্রাজ্য ছিল ক্ষুদ্র ও অর্ধবর্বর, ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে ইহার সহিত একমাত্র সমকালীন ঐশ্লামিক আরব সাম্রাজ্যই তুলনীয়। মিং হুয়াং-এর রাজত্বের শেষভাগে তাং বংশের অধোগতি শুরু হয়। বিভিন্ন দিক দিয়া তাং রাজত্ব চীন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি **বিশেষ স্থান** অধিকার করিয়াছে।

তাং রাজত্বকালে বহিঃশত্রু তাতারগণের বিতাড়নের ফলে চীন পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। **সাম্রাজ্যের** সীমা হান্ যুগের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। প্রায় সমগ্র খাস চীন ব্যতীত তাং রাজ্য দক্ষিণে ইন্দো-চীন এবং

উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়ার কিয়দংশে বিস্তৃত হয়। পশ্চিম দিকে এই বিস্তার সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। তারিম উপত্যকা, ট্রান্‌সোক্সিয়ানা ও তিব্বতে তাং সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। এমনকি পামির অতিক্রম করিয়া উত্তর সিন্ধু উপত্যকায় চৈনিক সামরিক শক্তি অনুভূত হয়।

বিশাল তাং সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য বিদেশী বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য বিরাট আকার ধারণ করে। স্থল (তারিম অববাহিকা) ও সমুদ্রযোগে এই বাণিজ্য চালিত হয়। চীনের দক্ষিণ উপকূলে বহু বিদেশী বণিকের সমাগম হইত এবং ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আরব ও পারসিক বণিকেরা বিশিষ্ট বন্দর ক্যান্টনে লুঠতরাজ করে। চীন রেশম, মশল্লা ও চীনামাটির বাসন রপ্তানি করিত এবং বিদেশ হইতে গজদন্ত, সুগন্ধি দ্রব্য, তাম্র, কাছিমের খোলা, গণ্ডারের শৃঙ্গ ও নিগ্রো দাস আমদানী করিত। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলশ্রুতিস্বরূপ অষ্টম ও দশম শতাব্দীর অন্তর্বর্তী সময়ে সমগ্র চীনে চা পানের **প্রচলন** হয়।


চীনামাটির পাত্র

বেশীসংখ্যক চৈনিক বণিক বিদেশ যাত্রা না করিলেও ভারতে চীনা বৌদ্ধদের পর্যটন অব্যাহত ছিল। তাং রাজত্বে এই সকল বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে **হিউয়েন সাং**-এর (Hiuen Tsang) নাম সর্বজনবিদিত। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকে হোনানে তাঁহার জন্ম হয়, হিউয়েন সাং-এর পিতা ছিলেন শিক্ষিত উচ্চ কর্মচারী। যৌবনে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি ঐ ধর্মের আচার্য হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু চীনে বৌদ্ধধর্ম নানাভাবে বিকৃত হইতেছিল বলিয়া তিনি নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐ ধর্মের জন্মক্ষেত্র ভারতে গিয়া উহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিবার মনস্থ করেন। বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাং তারিম অববাহিকার পথ ধরিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি বুদ্ধদেবের জীবন, বাণী ও নির্বাণ সংশ্লিষ্ট বহু স্থান দর্শন করেন, বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অধ্যয়ন করেন এবং

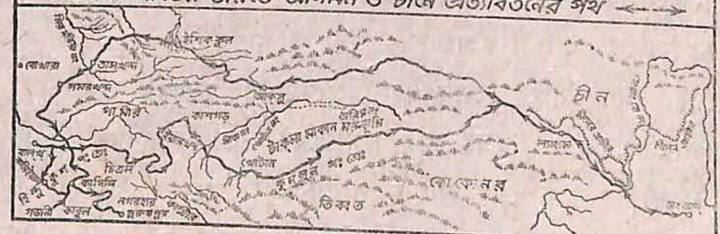
পবিত্র গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পামির ও খোটানের পথ ধরিয়া তিনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অধ্যাপনা ও প্রধানতঃ অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ৭৪টি গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি চীনে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা ও প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেন। দুইজন চৈনিক সম্রাট তাঁহার অনুবাদ-গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখেন। হিউয়েন সাঙের মৃত্যুর পর রাষ্ট্র সরকারী মর্যাদায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী এতই পরিপূর্ণ ও নির্ভুল যে আজও উহা প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিকট সমাদৃত হয়।



হিউয়েন সাং

তাং রাজত্বের প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম শক্তিসম্পন্ন ছিল, তাই এই সময় চীনের বৌদ্ধ যুগ বলিয়া অভিহিত হয়। ভারতে পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র-

হিউয়েন সাঙের ভারতে আগমন ও চীনে প্রত্যাবর্তনের পথ ←--→



গুলিতে চৈনিক পর্যটকদের পরিদর্শন অব্যাহত থাকে, উ হৌ প্রমুখ কতিপয়

শাসক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন, চেন-ইয়েন্ (Chen-yen) প্রভৃতি নূতন বৌদ্ধ মতবাদের উদ্ভব হয় এবং চৈনিক শিল্পে বৌদ্ধ বিষয়বস্তুর প্রাধান্য অটুট থাকে। কিন্তু তাং রাজত্বের শেষভাগে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি, কন্‌ফুসীয় মতবাদের (Confucianism) পুনরভ্যুদয় ও কয়েকজন চৈনিক সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণের ফলে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হয়। বৌদ্ধ যাজকপদে বরণ নিষিদ্ধ হয় (৮৩৫) এবং আরেকটি রাজকীয় আদেশের (৮৪৫) ফলে ৪০,০০০ বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস হয়, মন্দিরের জমি বাজেয়াপ্ত হয় এবং প্রায় তিন লক্ষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সাংসারিক জীবন পুনর্বরণ করেন।

তাং রাজত্বে কন্‌ফুসীয় মতবাদের বিকাশ ঘটে। এই মতবাদের ভিত্তিতেই চৈনিক শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজধানী ও প্রদেশসমূহে তাং সম্রাটেরা যে সকল বিদ্যালয় পোষণ করেন, সেখানে চৌ যুগের উৎকৃষ্ট কন্‌ফুসীয় সাহিত্য, সুমা চিয়েন ও হান্ বংশের ইতিহাস এবং আইন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানীতে সুন্দর হস্তলিপি ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রচলিত পরীক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতিস্বরূপ অনেক উচ্চ কর্মচারী মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তু ইউ-এর রচিত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থটি নূতন ধরনের ইতিহাস চর্চার পথ সুগম করে। লিউ চি-চি প্রণীত শি তুং ("ইতিহাসের ব্যাপক অনুশীলন") সূক্ষ্ম সমালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। কয়েকটি সুপরিচিত অভিধান এই সময় সঙ্কলিত হয়। হান্ ইউ (Han Yu) ছিলেন তাং যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য-সাহিত্যিক। তিনি গদ্যরচনায় নূতন যুগের সূচনা করেন।

তাং যুগে শ্রেষ্ঠ চৈনিক কবিতা রচিত হয়। বস্তুতঃ, সর্বকালীন চৈনিক সাহিত্যে লি পো ও তু ফু অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গণ্য হন। তাঁহারা পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং মিং হুয়াং-এর রাজত্বকালেই অধিকাংশ রচনা সম্পন্ন করেন। পথভ্রষ্ট লি পো মানুষের গতিবিধির স্থল এবং নির্জন পর্বত ও নদী এই উভয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কবিতা প্রধানতঃ স্বতঃস্ফূর্ত এবং আজও গীতিকাব্যিক সৌন্দর্য, নির্ভীক ও মৌলিক প্রকাশভঙ্গী, সুনিপুণ শব্দপ্রয়োগ এবং প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথা লঙ্ঘনের

জন্য পঠিত ও আদৃত হয়। স্বপ্নবিলাসী লি পো'র তুলনায় তু ফু ছিলেন অনেক বাস্তববাদী। তিনি জীবনে বহু হতাশা ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাই তাঁহার রচনায় দুঃখকষ্টের বর্ণনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

তাং যুগে বিভিন্ন ধরনের শিল্প বিকাশ লাভ করে। চীনা ভাস্কর্য উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছায়। চীনের শ্রেষ্ঠ চিত্রও এই যুগেই উদ্ভূত হয়। উ তাও-সুয়ান (Wu Tao-hsuan) ছিলেন তাং বংশের, তথা সর্বকালীন চীনের শিল্পের ইতিহাসে, সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। লি পো ও তু ফু-এর ন্যায় তিনিও ছিলেন মিং হুয়াং-এর রাজসভার একজন রত্ন। চীনা চিত্রের বিষয়-বস্তু বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম হইতে গৃহীত হয়। ভূভাগের দৃশ্য ছিল আরেকটি জনপ্রিয় বিষয়বস্তু এবং হান্ কান্ অশ্বের চিত্র অঙ্কনে খ্যাতি অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত, পুষ্প ও পক্ষী, গাছপালা ও কীটপতঙ্গ চিত্রকরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চীনামাটির মাধ্যমে চিত্রাঙ্কন বিশেষ প্রচলিত হয়।

তাং যুগের আরেকটি অবদান হইল মুদ্রণের প্রচলন। পৃথিবীর সর্ব-প্রথম অদ্যাপি বিদ্যমান মুদ্রিত পুস্তকটি তাং যুগের। ইহা হইল তুন্‌হুয়াঙের গুহা হইতে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধ সূত্র (৮৬৮)। মুদ্রণ সম্ভবতঃ বিশ্ব সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের একটি বড় অবদান। মুদ্রাক্ষরের পরিবর্তে ভারী কাঠের সাহায্যে এই মুদ্রণ হইত। পরবর্তীকালে চীনে মুদ্রণ প্রকর্ষ লাভ করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে চৈনিক সাম্রাজ্যে মুদ্রিত পুস্তক সংখ্যায় সম্ভবতঃ অন্যান্য দেশের মোট পুস্তক অপেক্ষা অধিকতর ছিল।

তাং বংশের প্রথম সম্রাট জোতজমা সমান করিবার উদ্দেশ্যে জমি পুনর্বণ্টনের আদেশ দেন। কিন্তু বৃহৎ ভূসম্পত্তি নিবারণের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। সাধারণতঃ কৃষকই ছিল জমির মালিক। জলসেচের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক খাল খননের কথা জানা যায়। ভূমি, ব্যবসায় ও পণ্যদ্রব্যের উপর কর ধার্য হইত। ভূমিকর, উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ ও শ্রমদান বহুকাল প্রচলিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষে রাজনীতিজ্ঞ ইয়াং ইয়েন্ এসবের পরিবর্তে ভূমিসংক্রান্ত একটি কর ধার্য করেন। তাম্র ও রেশম মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল। তবে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের পারলৌকিক চিন্তা-

ধারার প্রভাবে তাং যুগে কোন মৌলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সংঘটিত হয় নাই।

প্রতিবেশী দেশসমূহে বিশাল, সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ **চীন সাম্রাজ্যের প্রগাঢ় প্রভাব** তাং যুগের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্থই আমলেই বৌদ্ধধর্ম ও চৈনিক সংস্কৃতি **জাপানে** প্রবেশ করে। অতঃপর বহু জাপানী ছাত্র ও রাষ্ট্রদূত চীনে আসে, চীনা রাষ্ট্রদূতও জাপানে প্রেরিত হয়। চাং-আনের অনুকরণে জাপানীরা প্রথমে নারা (Nara) ও পরে হিয়ানে (Heian) তাহাদের রাজধানী স্থাপন করে। এতদ্ব্যতীত, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও প্রশাসনিক সংগঠনে জাপান চীনের অনুকরণ করে। **কোরিয়াও** চৈনিক সভ্যতা বহুলাংশে গ্রহণ করে। আধুনিক যুগের ফরাসী **ইন্দো-চীনের** অনেকাংশ তাং সাংস্কৃতিক আওতায় আসে। **তিব্বত** উহার বৌদ্ধধর্মের কিয়দংশ চীন হইতে আহরণ করে। তাং যুগেই কাগজের ব্যবহার চীন হইতে **সমারকান্দ্‌ ও পশ্চিম এশিয়ায়** প্রচলিত হয়।

মানবজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাং বংশ এক **মহান্‌ যুগ**। প্রশাসনিক কৌশলে তাং শাসকদের মৌলিক অবদান না থাকিলেও তাহাদের **আইন সংহিতা** বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কবিতা, ভাস্কর্য ও মৃৎপাত্র নির্মাণে তাংদের অবদান অনতিক্রমনীয়। বৌদ্ধধর্ম চরম উন্নতি লাভ করে এবং বৌদ্ধ দর্শনে প্রগাঢ় মানসিক উৎকর্ষ ও ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্যিত হয়। অতীতের তুলনায় চৈনিক সভ্যতা ইয়াংসি-র দক্ষিণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাংশাসিত চীন প্রতিবেশীদের সবিশেষ প্রভাবিত করে। তাং যুগের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় এবং চীনারা যথার্থ সগৌরবে এই যুগ স্মরণ করিতে পারে।

স্থং (Sung) যুগ (৯৬০-১২৭৯ খ্রীঃ)

তাংদের পতনের পর অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচটি রাজবংশের শাসন কায়েম হয়, কিন্তু ইহারা কেহই সমগ্র চীন করায়ত্ত করে নাই। তবে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও চীনের সাংস্কৃতিক উন্নতি অটুট থাকে। দশম শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক চৈনিক প্রধান সেনাপতি স্থং বংশের স্থাপনা করেন, কিন্তু এই বংশ কখনোই সমগ্র খাস চীনে বা সীমান্তবর্তী

দেশে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে চীন্ (Chin) নামে এক মাঞ্চুরীয় বংশ প্রায় সমগ্র উত্তর চীন দখল করে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল নামে এক পরাক্রান্ত শক্তি চীন ও সুংদের পরাস্ত করিয়া সর্বপ্রথম সমগ্র চীন বিদেশী শাসনাধীন করে।

রাজনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সুং শাসন চীনের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এক স্বতন্ত্র যুগের সূচনা করে। পূর্বেকার শাসনযন্ত্র, আইন ও শাসন-কৃত্যক সংক্রান্ত পরীক্ষা পরিবর্তিত আকারে অক্ষুণ্ণ থাকিলেও সুং যুগের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এই সময় চৈনিক সংস্কৃতির কেন্দ্র হুয়াংহো উপত্যকা হইতে নিম্ন ইয়ংসি উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়। মুদ্রণের আরো উন্নতি হয় এবং অদ্যাপি বিদ্যমান কয়েকটি সুং পুস্তক মুদ্রণ শিল্পের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হয়। চীনামাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সুং আমলের মৃৎপাত্র উত্তম রুচি, সুচিন্তিত আড়ম্বরহীনতা ও নির্মাণকৌশলের জন্য প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ একটি বা দুইটি রং-এর ব্যবহার হইলেও খাঁটি সাদা চীনামাটির জিনিসও নির্মিত হইত। চিত্রাঙ্কনের বিশেষ উন্নতি হয়। পুষ্প, পক্ষী, পশু, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব ছিল চিত্রের বিভিন্ন বিষয়বস্তু। কিন্তু ভূভাগের দৃশ্যের অতিসুন্দর চিত্রের জন্যই সুং যুগ বিখ্যাত। এই চিত্র-গুলিতে চিত্রকরের হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুং যুগে কন্‌ফুসীয় দর্শনের পুনর্ব্যাখ্যা হয়। প্রাচীন কন্‌ফুসীয় মতবাদ, বৌদ্ধ ও তাও ধর্মের কিয়দংশ এবং চু শি'র বক্তব্যের সংমিশ্রণে অভিনব কন্‌ফুসীয় মতবাদের (Neo-Confucianism) উদ্ভব হয়। নব্য কন্‌ফুসীয়েরা ধর্মে বিশেষ বিশ্বাস করিত না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুং বংশের অবদান নগণ্য নহে। বহু কবিতা রচিত হয় এবং এযুগের সর্বোৎকৃষ্ট চীনের সর্ব-কালীন শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম। কয়েকটি কবিতায় মৌলিক প্রকাশভঙ্গী দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি হয় এবং উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মাতৃ-ভাষায় উপন্যাস রচনা অব্যাহত থাকে। সুং যুগে চীনের কয়েকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়। সম্ভবতঃ সুং আমলেই যুদ্ধে বারুদ প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং জাহাজ-নির্মাণ ও দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ব্যবহারে উন্নতি হয়।

সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার জন্য সুং রাজত্ব বিখ্যাত। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা উন্নত এবং উত্তর চীনের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বনিয়াদ্ শক্ত করিবার উদ্দেশ্যে **ওয়াং আন্-শি** (Wang An-shih, ১০২১-৮৬) নামে জনৈক কর্মপটু রাজনীতিজ্ঞ পশ্চিমী সমাজবাদের তুলনীয় এক কর্মসূচী সম্পাদন করেন। এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল : (১) সরকারের ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে খসড়া বার্ষিক আয়ব্যয়ের বিবরণী তৈয়ার, (২) **রাষ্ট্রের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের** মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ ও প্রাচুর্যের সময়ে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ ব্যবস্থায় সমতা রক্ষা, (৩) পরিপক্ক হইবার কালে শস্য বপন ও সংগ্রহের সাহায্যার্থে **রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষকদের ঋণদান**, (৪) ভূমি-কর ন্যায়সম্মতভাবে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সমভাগে জমির বিভাজন ও বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ, (৫) ব্যক্তির সম্পদের অনুপাতে স্থাবর ও অস্থাবর **সম্পত্তির উপর কর** স্থাপন, (৬) সরকার কর্তৃক বেগার শ্রম ব্যবস্থা বিলোপ, (৭) সামরিক পুনর্গঠন, (৮) অশ্বারোহী বাহিনীর উন্নতি, এবং (৯) সরকারের ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকৃত্যক পরীক্ষার পুনর্বিন্যাস। ইহাদের কয়েকটি প্রস্তাব ধনীশ্রেণীর স্বার্থের বিশেষ পরিপন্থী হওয়ায় প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। প্রথমে সম্রাট ওয়াংকে সমর্থন করিলেও পরে এই কর্মসূচী পর্যায়ক্রমে গৃহীত ও বাতিল হয় এবং অবশেষে অধিকাংশই পরিত্যক্ত হয়। তবে ইহার অংশবিশেষ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় স্থায়িত্ব লাভ করে। সুং রাজত্বের শেষদিকে ভূমি সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হইলেও জমিদারদের বিরোধিতায় তাহা ব্যর্থ হয়।

ইয়ুআন্ (Yuan) যুগ (১২৭৯—১৩৬৮)

মোঙ্গলদের সময় চীন বিশ্বের বৃহত্তম স্থল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কুব্লাই খাঁর আমলে মোঙ্গল সাম্রাজ্য পশ্চিমে ইউরোপীয়, রাশিয়া, পারস্য ও মেসোপটেমিয়া হইতে পূর্বে চীন সাগর এবং উত্তরে মঙ্গোলিয়ার বহিঃ-সীমান্ত হইতে দক্ষিণে ইন্দো-চীন পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ভূখণ্ডেই কুব্লাই-এর নিয়ন্ত্রণ ছিল নামেমাত্র। এতদ্ব্যতীত, মোঙ্গল সাম্রাজ্য চরম সীমায় পৌঁছাইলেও তিনি জাপান, অ্যান্নাম্ (Annam), ব্রহ্মদেশ ও

জাভা জয় করিতে বিফল হন। **আভ্যন্তরীণ রাজনীতির** ক্ষেত্রে কুব্‌লাই বিজিতের তোষণ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেন। উদ্বৃত্ত শস্য অভাবের সময় বিতরণের জন্য সরকারী শস্যভাণ্ডারে মজুত হইত। কুব্‌লাই বৃদ্ধ পণ্ডিত, অনাথ শিশু ও রুগ্নের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানের এবং দরিদ্রদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষায় উৎসাহ দেন। পরধর্মসহিষ্ণু কুব্‌লাই **তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের** প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তিব্বতী অক্ষরের ভিত্তিতে এক নূতন মোঙ্গোলীয় বর্ণমালা প্রচলন করান। কিন্তু সরকারীভাবে তিনি সকল ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষণ করেন। কন্‌ফুসিয়াসের মতবাদ ও বংশধরদের সম্মানিত করিয়া কুব্‌লাই উত্তর চীনে ঐ মতবাদের পুনরভ্যুদয়ে সাহায্য করেন। কুব্‌লাই চৈনিক সম্রাটরূপে শাসন করিতে সচেষ্ট হইলেও এবং তাঁহার বংশ সরকারীভাবে ইয়ুআন্ রূপে পরিচিত হইলেও মোঙ্গলরা কখনোই নিজেদের পুরো চৈনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করে নাই। কতিপয় চীনা পণ্ডিত তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং বহু মোঙ্গল চৈনিক সংস্কৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে স্বল্পসংখ্যক চীনাই উচ্চপদ লাভ করে। কুব্‌লাই তাঁহার রাজধানী কারাকোরাম হইতে পরবর্তীকালের পিকিং-এর সন্নিকটে স্থানান্তরিত করেন। ক্যাম্বালুকে (Cambalue) জাঁকালভাবে এক নূতন নগরী নির্মিত হয়, মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে এখানে বিরাট জনসমাগম হয় এবং ইহা ইউরোপীয় পর্যটকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে কুব্‌লাই একটি প্রকাণ্ড খাল (Grand Canal) পুনর্নির্মাণ করিয়া উত্তরের সহিত ইয়াংসি উপত্যকা সংযুক্ত করেন।



কুব্‌লাই খাঁ

কুব্‌লাই-এর মৃত্যুর (১২৯৪) পর মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে, চৈনিক সিংহাসন ক্রমান্বয়ে দুর্বল সম্রাটদের হস্তগত হয়। অত্যধিক কর ও

বন্যার ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং দীর্ঘ ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পর নিম্নবংশীয় এক চীনা বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া ক্যাম্বুলাক্ দখল (১৩৬৮) করে। এইভাবে চীনে মিং রাজত্বের সূচনা হয়।

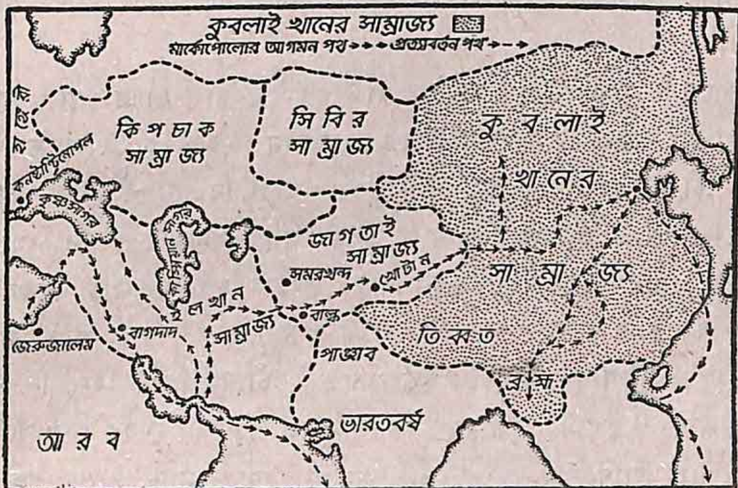
মোঙ্গল আমলে সামগ্রিকভাবে চৈনিক সংস্কৃতির কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে চিত্রে ভাবাবেগ, বর্ণ ও দৈনন্দিন জীবন অঙ্কনের প্রাধান্য এবং কয়েক প্রকার শিল্প কৌশলে পারসিক প্রভাব লক্ষ্যিত হয়। এই সময়েই প্রথম ব্যাপক কার্পাস চাষের সূচনা হয়। মোঙ্গল যুগে নাটক ও উপন্যাসের দ্রুত উন্নতি হয় এবং কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়। মোঙ্গল সাম্রাজ্যের আনুকূল্যে মধ্য এশিয়ার উভয় দিকের মধ্যে ভ্রমণ ও বাণিজ্য সহজ হয় ফলে চীনে বহু আরব, পারসিক এবং পশ্চিম ইউরোপীয় বণিক ও ধর্মপ্রচারকের সমাগম হয়। মধ্যযুগের এই সকল দুঃসাহসী বীরের মধ্যে ভেনিসবাসী মার্কো পোলোর (Marco Polo) নাম জগদ্বিখ্যাত।



মার্কো পোলো

দক্ষিণ চীনে মোঙ্গল রাজত্ব কায়েম হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে মার্কোর পিতা ও পিতৃব্য, নিকোলো (Nicolo) ও মাফিও (Maffeo), ক্যাম্বুলুকে আসেন। তাঁহাদের নিকট খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য শুনিয়া কুব্লাই ১০০ জন ধর্মপ্রচারক প্রেরণের অনুরোধ সম্বলিত পোপকে লিখিত চিঠি সমেত পোলো ভ্রাতৃদ্বয়কে স্বদেশে পাঠান। অবশেষে পোলো ভ্রাতৃদ্বয় যখন দ্বিতীয়বার চীন অভিমুখে যাত্রা করেন (১২৭১), তরুণ যুবক মার্কো ও মাত্র দুইজন খ্রীষ্টান যাজক তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। কিন্তু পথের বিপদে শঙ্কিত হইয়া যাজকেরা অল্পদূর যাইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। পোলোরা পারস্য অক্সাস্, পামির ও তারিম্ উপত্যকা ধরিয়া চীনে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট কুব্লাই পোলোদের বিশেষ সম্বর্ধনা করেন (১২৭৫) এবং একুশ বৎসর বয়স্ক মার্কোর উজ্জ্বল দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মার্কো

রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া সযত্নে চৈনিক ভাষা শিক্ষা করেন। অতীব প্রীত হইয়া কুব্‌লাই তাঁহাকে হ্যাঙ্‌চাউ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।



সম্রাটের নির্দেশে মার্কো চীন ছাড়াও এশিয়ার বহু দেশ পরিদর্শন করিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। অতঃপর এক মোঙ্গল রাজকুমারীর সহিত পারস্যের মোঙ্গল খানের বিবাহ স্থির হইলে পোলো বংশীয় তিনজন রাজকুমারীর সহিত পারস্য অভিমুখে প্রেরিত হইলেন (১২৯২)। রাজকুমারীর সহচর দল দক্ষিণ চীনের **জাইতুন্‌** বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া **সুমাত্রা ও ভারত** অতিক্রমণের পর পারস্যে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ বৎসর পর পোলোরা ভেনিস প্রত্যাবর্তন করিলে আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহাদিগকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসের সহিত জেনোয়ার জলযুদ্ধে মার্কো পোলো বন্দী হইলেন। জেনোয়ার কারাগারে অবসর সময়ে তিনি তাঁহার বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী ও মন্তব্য রাসটিসিয়ানো নামে জনৈক সহবন্দীকে লিপিবদ্ধ করিতে বলেন। তাহাই পরে মার্কো পোলোর **ভ্রমণ কাহিনীরূপে** ইতিহাস, সাহিত্য ও ভূগোলে খ্যাতিলাভ করে। বহু সংস্করণবিশিষ্ট এই গ্রন্থটি ভূগোল সম্পর্কে ইউরোপীয়দের জ্ঞান ও ভৌগোলিক আবিষ্কার সবিশেষ প্রভাবিত করে। আর কোন ভ্রমণবৃত্তান্ত এতো প্রচারিত হয় নাই বা এতো সুদূর-

প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে নাই। এই ভ্রমণ-কাহিনী কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। অদ্যাপি ইহাই মোঙ্গল যুগে চীন এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের অন্যতম উৎকৃষ্ট উপাদান।

পোলোর ভ্রমণ-কাহিনীতে কুব্‌লাই-এর সুবিশাল সাম্রাজ্যের বহু তথ্য পাওয়া যায়। সম্রাটের দরবারে প্রতিদিন অজস্র হাতী, ঘোড়া ও উট উপঢৌকনস্বরূপ আসিত। তিনি মধ্যে মধ্যে বিরাট ভোজ দিতেন। কুব্‌লাই দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। চীনের ন্যায় সমৃদ্ধ দেশ সে সময়ে পৃথিবীতে আর ছিল না। কোন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজারা রাজকর হইতে অব্যাহতি পাইত। সমগ্র দেশব্যাপী অসংখ্য বৌদ্ধ-বিহার, পান্থশালা, দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও পুষ্পোদ্যান মানুষকে মুগ্ধ করিত। চীনের শিল্পী ছিল নিপুণ, চীনের জরি ও রেশমের সূক্ষ্ম বস্ত্র অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কৃষির জন্য ছিল খাল, আর বাণিজ্যের জন্য ছিল অসংখ্য বন্দর, নগর, ভাণ্ডার-গৃহ ও বিপণি। নগরের অট্টালিকা, প্রাসাদ ও প্রশস্ত রাজপথ দেশের সমৃদ্ধির পরিচয় দিত। হ্যাংচাউ শহরটি 'চীনের ভেনিস' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এখানে বহু খাল ও স্নানাগার ছিল। সুদূর ভারত, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া এই বন্দরে যাতায়াত করিত। মার্কো চীন হইতে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, মানচিত্র, কাগজের টাকা ও মুদ্রা ইউরোপে আনিয়াছিলেন।

জাপান ও ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। জাপানে নাকি অপরিমিত সোনা পাওয়া যাইত, ব্রহ্মদেশে নাকি বিরাট শ্বেতহস্তী বাহিনী ছিল। সিংহলের নিকটবর্তী সমুদ্র হইতে মুক্তা উত্তোলনের কথা দাক্ষিণাত্যের কাকতীয় রাজ্যে রাণী রুদ্রাম্মার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ এবং এক শ্রেণীর যোগী সম্প্রদায়ের কথা তিনি লিখিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীরা নগ্ন থাকিতেন ও গায়ে ভস্ম লেপন করিতেন। ইহারা আহারবিহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ও আশ্চর্য যোগবলের অধিকারী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল বাঁচিতেন।

প্রাক্-চৈনিক জাপান—খ্রীষ্টাব্দের সূচনায় মধ্য জাপানের ইয়ামাতো (Yamato) অঞ্চলের পুরোহিত-অধিনায়ক অন্যান্য গোষ্ঠীর নেতাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া জাপানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়া-মাতো জাতির ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি কালক্রমে সমগ্র জাপানে গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রাচীন রাজতন্ত্র বিশেষ কেন্দ্রীভূত ছিল না।

চীনের প্রভাব—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে জাপানীরা চৈনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। বৌদ্ধধর্ম ইয়ামাতো রাজসভায় **প্রবর্তিত** হয় এবং বহু ব্যক্তি ঐ ধর্মে দীক্ষিত হয়। এইভাবে চৈনিক সংস্কৃতির মাধ্যমে জাপানের রূপান্তরের সূচনা হয়। কিন্তু এই রূপান্তর বৈপ্লবিক হইলেও প্রাচীন শাসকশ্রেণী এবং জাপানী জীবনের মূল গঠন বহুল পরিমাণে অটুট থাকে।

চীন ও বৌদ্ধধর্মের স্বপক্ষে দলগুলি ইয়ামাতো রাজসভায় আধিপত্য স্থাপন করায় যুবরাজ **শোতোকু তাইশির** নেতৃত্বে মৌলিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত হইল। নৈতিক অনুশাসন সংক্রান্ত সংহিতা জারি করিয়া (৬০৪) তাইশি প্রচার করেন যে রাজাই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। অতঃপর সংস্কারকেরা তাং চীনের অনুকরণে ইয়ামাতো রাষ্ট্র পুনর্গঠন করিতে বদ্ধ-পরিকর হন। **তাইকোয়ার** ("বিরাট সংস্কার," ৬৪৫-৫০) মাধ্যমে তাহাদের ভাবধারা কিছুটা রূপায়িত হয়। ক্ষমতা অধিকতর কেন্দ্রীভূত করিবার উদ্দেশ্যে নূতন করব্যবস্থা, স্থানীয় শাসন ও ভূমি ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়। চৈনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সম্রাটের মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু প্রথম হইতেই **বৃহৎ পরিবারগুলি বিশেষ সুবিধা** আদায় করে। জাপানী রাজবংশ স্থায়ী সম্পত্তিরূপে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, শক্তিশালী পরিবারবর্গের বংশধরেরা কেন্দ্রীয় শাসনের উচ্চ পদগুলি দখল করে এবং বিরাট প্রভাবশালী স্থানীয় নেতারা প্রাদেশিক

শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। শাসনকৃত্যক সংক্রান্ত পরীক্ষা সঙ্কীর্ণ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হয়। তৃতীয়তঃ, প্রধান শিণ্টো (Shinto) মন্দির ও পুরোহিতেরা এবং বৌদ্ধ মঠ ও সন্ন্যাসীবর্গ বিশেষ অধিকার লাভ করে। আইকোয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক পুনর্গঠনের পর সংস্কারকেরা তাইহো ("বিরাট ধন") সংহিতার (৭০১-৭০৪) মাধ্যমে তাং চীনের অনুকরণে এক জটিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল না হইলেও সংস্কারপন্থী জাপানীরা চৈনিক কিংবদন্তী অনুযায়ী তাহাদের শাসককে সর্বশক্তিমান রাজা মনে করিল। কিন্তু প্রধান পুরোহিতরূপে জাপানী রাজার আদিম ও দেশীয় প্রকৃতি বজায় রহিল। এই ভাবে জাপানী ও চীনা ব্যবস্থার সংমিশ্রণে জাপ সম্রাটেরা **প্রধান শিণ্টো পুরোহিত ও শক্তিশালী শাসকের দ্বৈত ভূমিকা** গ্রহণ করেন।

নারা, ৭১০-৭৮৪—তাং চীনের রাজধানী চাং-আনের আদর্শে জাপানীরা নারায় তাহাদের প্রথম বড় শহর ও স্থায়ী রাজধানী নির্মাণ করে। নূতন রাষ্ট্রিয় ধর্ম হিসাবে **বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রভাব** অর্জন করে। শিণ্টো ধর্ম উহার স্বাতন্ত্র্য ও প্রভাব বজায় রাখিলে ও হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম জাপানে, বিশেষতঃ ইহার সমাজের উচ্চ স্তরে, অসাধারণ দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয়। বৃহৎ মন্দির, মঠ ও বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। সরকার শক্তিশালী বৌদ্ধ যাজক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য বৌদ্ধ মঠগুলিকে জমি দান করে। মধ্যযুগীয় ইউরোপের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের ন্যায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও মঠেরা বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণে উৎসাহ দান এবং অনাথ আশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন।

মার্জিত জাপানী সভাসদ্‌বর্গ সুপ্রাচীন ও লিখিত চীনা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও আকৃষ্ট হয়। কন্‌ফুসিয়ানের প্রবন্ধ সমেত চীনা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থগুলি পঠিত হয়। ক্রমে জাপানীরা নিজস্ব সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়। কবিতা রচনায় নারা ছিল এক গৌরবময় যুগ। **মানিওষু** ("এক সহস্র পত্রের সংগ্রহ") নামক সুন্দর কবিতা-সংগ্রহটি জাপানী কাব্যে অদ্বিতীয়। চীনা সরকার ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দিতেন বলিয়া নারার সম্ভ্রান্তসম্প্রদায় এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। অচিরেই **কোজিকি**

("প্রাচীন বিষয়ের বিবরণ," ৭১২) ও **নিহোন্‌-শোকি** ("জাপানের ইতিবৃত্ত," ৭২০) প্রকাশিত হয়। এই দুই গ্রন্থ জাপানের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান লিখিত উপাদান। জাপান চৈনিক শিল্পরীতি গ্রহণ করিলেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া নারা রাষ্ট্র প্রধানতঃ ধান উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শ্রেণীর জীবনযাপনের মানও উন্নত হয়। কিন্তু প্রভাবশালী পরিবার-বর্গ আপন জমিগুলি করমুক্ত করিলে দেউলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য কর বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হয়। ফলে একদিকে কৃষক ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর মানুষ করভারে নিপীড়িত হয়, অন্যদিকে স্থানীয় রাজকর্মচারী, স্থানীয় গোষ্ঠী ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়। রাজশক্তির দৈন্যের ফলে শক্তিশালী ফুজিওয়ারা বংশ কর্তৃক রাজদরবার নিয়ন্ত্রণের পথ প্রশস্ত হইল।

হিয়ান্‌ যুগে জাপান, ৭৮৪-১১৮৫—তাং চীনের অবনতি এবং জাপানীদের ক্রমবর্ধমান মানসিক উৎকর্ষের ফলে এই যুগে জাপানীরা চৈনিক ভাবধারার সহিত আপন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য বিধান করে। ফলে একটি **পরিপূর্ণ স্বদেশী সংস্কৃতি** গড়িয়া উঠে। শক্তিশালী নারা বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সরকারকে ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট কাম্মু **হিয়ানে** ("শান্তিনগর" আধুনিক কিয়োতো) **রাজধানী** স্থানান্তরিত করেন। বৌদ্ধদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দমন করিয়া সম্রাট বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রভুত্ব ও দেশী সিন্টো অনুষ্ঠান পদ্ধতির সংমিশ্রণে এক **জাতীয় ধর্ম** প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে বিদেশী বৌদ্ধধর্ম স্বদেশানুরাগী বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের রক্ষাকবচে পরিণত হয়।

চাং-আনের নমুনায় নির্মিত নূতন রাজধানী কিয়োতো বিশ্বের অন্যতম সুন্দর ও বিশাল নগরীতে পরিণত হয়। এখানে জাপানী রাজসভা এবং উহার অভিজাত (Kuge, কুজে) ও সাহিত্যিক সম্প্রদায় জাপানী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করে। **কোকিন্‌শিউ** ("প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য") নামক দ্বিতীয় প্রখ্যাত কবিতা-সংগ্রহটি প্রকাশ পায় (৯২২)। মুরাসাকি শিকিবু নাম্নী রাজসভার এক সম্ভ্রান্ত মহিলা কর্তৃক রচিত

উপন্যাস, গেঞ্জী মোনোগাতারি (১০০৪), বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা-রূপে আদৃত হয়। রচনাশৈলী ব্যতীত হিয়ান্ সমাজের আলেখ্য হিসাবেও এই গ্রন্থ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সুসভ্য, মার্জিত ও ভোগবিলাসী কিয়োতো নগরীর সাহিত্যে সুকুমার সাহিত্যের প্রাধান্য দেখা যায়। নবম-দশম শতাব্দীর মধ্যে জাপানীরা তাহাদের ভাষা লিখিবার শব্দসূচক পদ্ধতি আবিষ্কার করে। কালক্রমে চীনা শিল্পের বলিষ্ঠতা বর্জিত, কোমলভাবযুক্ত জাপানী শিল্পের অভ্যুদয় ঘটে।

হিয়ান্ যুগেই চীনা প্রভাবে স্থাপিত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের আমূল পরিবর্তন হয়। জাপানে চীনের ন্যায় শাসনকৃত্যক সংক্রান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইলেও উহা প্রধানতঃ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং উচ্চ পদগুলি প্রভাবশালী পরিবারবর্গের জন্য রক্ষিত হইত। **কেন্দ্রীয় সরকার** এক **নিরর্থক কৃত্রিমতায় পর্যবসিত** হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে রাজপরিবার বিশেষ মর্যাদা ভোগ করিলেও প্রকৃত ক্ষমতা শক্তিশালী ফুজিওয়ারা পরিবারের হস্তগত হয় এবং নামেমাত্র **সম্রাটেরা তাহাদের ক্রীড়নকে পর্যবসিত হইলেন।** এই পরিবার বহু জমি দখল করে এবং তরুণ সম্রাটদের সহিত আপন কন্যাদের বিবাহ দিয়া রাজধানী ও রাজসভায় সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করে। ফলে ফুজিওয়ারা বংশের বহির্ভূত বহু উচ্চাভিলাষী ও কর্মক্ষম ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে বিশাল ভূসম্পত্তি লাভ ও স্থানীয় স্বাধীনতা সুদৃঢ় করিয়া এক **নূতন সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক অভিজাত শ্রেণীর** ভিত্তি রচনা করে। সম্রাটের গৌরব ও কুজের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা অটুট রহিলেও **দ্বাদশ শতাব্দীতে** সম্ভ্রান্ত জমিদার সামন্তেরা (**বুকে**) ও তাহাদের পরিশ্রমী সৈন্যগণ (**বুশি**) **প্রকৃত ক্ষমতা** লাভ করে। বিশিষ্ট সামরিক পরিবারবর্গ **দাইমিয়ো** এবং তাহাদের সশস্ত্র অনুচরেরা **সামুরাই** নামে পরিচিত হয়। তাইরা (Taira) ও মিনামোতো (Minamoto) ছিল সামরিক পরিবারগুলির দুইটি প্রধান দল। ইহাদের মধ্যে দীর্ঘকালের বিবাদ ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রামের চাপে কিয়োতোর অসামরিক শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং একদা শক্তিশালী ফুজিওয়ারা রাজধানীতে শৃঙ্খলা রক্ষার

জন্য যে কোন সামরিক দলের সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। দান-নো-উরার নৌ-যুদ্ধে (১১৮৫) মিনামোতোরা জয়ী হইয়া প্রথম **নিরঙ্কুশ সামরিক ক্ষমতাপন্ন সরকার** প্রতিষ্ঠা করে।

কামাকুরা ঃ ১১৮৫-১৩৩৮—অতিমার্জিত, বিলাসপ্রিয় কিয়োতোর সংস্রব এড়াইবার জন্য বিজয়ী মিনামোতো **ইওরিতমো** (Yoritomo) মিনামোতোদের সর্বাধিক শক্ত ঘাঁটি পূর্ব জাপানের **কামাকুরা** নামক সমুদ্রপার্শ্ববর্তী গ্রামে তাঁহার শাসনকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। রাজশক্তির আধিপত্য স্বীকার করিয়া ইওরিতমো সম্রাট, ফুজিওয়ারা ও কুজেদের কিয়োতোয় তাহাদের অলীক অসামরিক শাসনের বাহ্য অবয়ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনুমতি দেওয়ায় **সম্রাট জাপানের প্রকৃত শাসক এই অসত্য** বজায় রহিল। ইওরিতমো সম্রাটের নিকট বংশানুক্রমিক **শোগুন** ("প্রধান সেনাধ্যক্ষ") উপাধি গ্রহণ করিয়া (১১৯২) দেশের সমগ্র সেনাবাহিনীর উপর আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপন করিলে এই অসত্য আরো সুদৃঢ় হয়। বস্তুতঃ, ইওরিতমোর নেতৃত্বাধীন **সামরিক সমিতিই** প্রকৃত ক্ষমতা লাভ ও **প্রকৃত শাসন চালনা** করে। এইভাবে কামাকুরায় যে সামরিক শাসনের উদ্ভব হয় তাহা **বাকুফু** ("তাঁবু সরকার") নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রটি সামরিক, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় এই তিন ভাগে পরিচালিত হয়। নিজ নিজ ভূসম্পত্তিতে জমিদারেরা কার্যতঃ স্বাধীন হইলেও তাহারা শোগুনের আইনগত ও সামরিক ক্ষমতা স্বীকার করে। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপের ন্যায় জাপানের সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিসম্পন্ন বংশানুক্রমিক ভূমিভিত্তিক অভিজাতশ্রেণীর শাসনের সূচনা হয়।

ইওরিতমোর আকস্মিক মৃত্যুর (১১৯৯) পর শোগুন সামরিক শাসনের নামমাত্র প্রধান রহিলেও কিয়োতোর সম্রাটের ন্যায় দুর্বল ক্রীড়ণকে পর্যবসিত হন। ইওরিতমোর প্রত্যক্ষ বংশ অচিরে শেষ হইলে শোগুন পদ অভিজাত ফুজিওয়ারা বংশ কিংবা রাজবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। **প্রকৃত ক্ষমতা** ইওরিতমোর স্ত্রীর **হোজো** পরিবারের **হস্তগত** হয় এবং তাহারা বংশানুক্রমিক তত্ত্বাবধায়ক (Regent) রূপে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে

(১২০৫-১৩৩৩)। অত্যন্ত দক্ষ হোজো তত্ত্বাবধায়কদের নেতৃত্বে বাকুফু স্থায়ী, ন্যায্য ও কর্মকুশল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কালক্রমে কামাকুরা রাজত্বের অধোগতি শুরু হয়। কিয়োতোর কুজেরা এখানে আসিয়া ভোগ-বিলাসী চালচলন প্রবর্তন করিলে কামাকুরার অভিজাত শ্রেণী দুর্বল হইয়া পড়ে। মোঙ্গল আক্রমণ (১২৭৪, ১২৮১) জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ও জাপানী শৌর্যের সাহায্যে প্রতিহত হইলেও জাতীয় রাজস্বে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে। দেউলিয়া শোগুনতন্ত্র কর বৃদ্ধি করিলে স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা দেয়। সামন্ত ও পুরোহিতেরা দেশরক্ষার্থে তাহাদের ত্যাগের প্রতিদান স্বরূপ জমি চাহিলে বিফল হয়। এইভাবে **প্রবল গৃহ যুদ্ধ** শুরু হইলে বাকুফু শোচনীয় পরাজয় বরণ করে, কামাকুরা ধৃত (জুলাই ১৩৩৩) ও অগ্নিদগ্ধ হয়, **হোজো প্রভুত্বের অবসান** ঘটে এবং (কুজেদের নেতৃত্বে) কিয়োতোয় অসামরিক সরকার স্থাপিত হয়।

আশিকাগা শোগুনতন্ত্র ১৩৩৬-১৫৭৩—কিন্তু কুজেদের দেশ শাসন করার উপযোগী সঙ্গতি ও যোগ্যতা ছিল না। সেনাবাহিনী পুনরায় পুরোভাগে আসিল এবং বিদ্রোহী প্রধান সেনাপতি আশিকাগা তাকাউজি **শোগুনতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা** করেন। তাকাউজি শোগুন রূপে অভিহিত হইলেন (১৩৩৮) বাকুফুর কেন্দ্র কিয়োতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় রাজদরবার আশিকাগার নিয়ন্ত্রণাধীন হইল। কিন্তু **শোগুন** কেবলমাত্র **ক্রীড়ণকে পরিণত** হন এবং বাকুফুর অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করেন। তবে রাজধানীতে সেনাবাহিনীর আধিপত্য রহিলেও জমি বা সামন্তলাভের উদ্দেশ্যে অবিরাম সামন্ততান্ত্রিক দ্বন্দ্বের ফলে প্রদেশসমূহে **কেন্দ্রীয় শাসন** অত্যন্ত **দুর্বল** হইয়া পড়ে, রাজবংশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং বড় **সামন্ত জমিদারেরা স্বায়ত্তশাসনের** অধিকার লাভ করে।

কামাকুরা ও আশিকাগা আমলে সংস্কৃতি—কামাকুরার নূতন সংস্কৃতিতে সৈনিক শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিফলিত হয়। ইহাদের আত্ম-নিয়মানুবর্তিতা ও বৈরাগ্যের আদর্শ ধর্মে নূতন কৌতূহলের উদ্রেক করে। এই ধর্মীয় জাগরণের ফলে জনসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য বৌদ্ধধর্ম এবং আত্মনির্ভরশীল জেন্ (Zen) বৌদ্ধধর্ম উদ্ভূত হয়। জেন্ কঠোর

নিয়মানুবর্তিতা, আত্মনিগ্রহ ও আড়ম্বরহীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করায় সামুরাইদের নিকট বিশেষ জনপ্রিয় হয়। জেন্ সন্ন্যাসীরা সামরিক শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মীয় ও উপদেষ্টা হইলেন। আশিকাগা যুগ বুকেদের গ্রামীণ সামরিক সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির সহিত কুজেদের পৌর অসামরিক সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করে। বাকুফু কিয়োতোয় স্থানান্তরিত হইলে সৈনিকরা সেখানে যাইয়া কুজেদের আচার ও রীতি গ্রহণ করিতে থাকে, ফলে যে সভ্যতা অতীতে প্রধানতঃ কিয়োতো রাজদরবার ও মঠের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা ক্রমে বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত হয়।

এই সময়ে জেন্ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়। সুং ও ইউয়ান্ নমুনার অনুপ্রেরণায় জাপানী চিত্রশিল্প উৎকর্ষ লাভ করে। নো (No) নামক দেশী নাটক বিশেষ উন্নতি করে। চীনের অনুপ্রেরণায় আশিকাগা আমলে উৎকৃষ্ট পুষ্প শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থা (**ইকেবেনা**) প্রচলিত হয়।

বিভিন্ন কারণে দেশী ও বিদেশী **বাণিজ্য প্রসারিত হয়।** প্রধানতঃ জেন্ সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় চীনের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। বহির্বাণিজ্যে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে কতিপয় আশিকাগা শোগুন চীনের নিকট এমনকি অধীনতাও স্বীকার করেন। জাপানী বণিকেরা চীন, কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত করে। বণিক, মহাজন ও বণিক-সমিতি সমন্বিত সওদাগরী নগরীর উৎপত্তি হয়। নগরবাসীরা বিশেষ অধিকার লাভ করে। কিন্তু জাপানের **অর্থনৈতিক উন্নতি** ছিল **সামঞ্জস্যবিহীন**। একদিকে ধনী জমিদারেরা অর্থের অপচয় করিত, অন্যদিকে করভারে নিপীড়িত কৃষকেরা ছিল সর্বদাই দরিদ্র। অন্যান্য **সামাজিক পরিবর্তনের** মধ্যে গোষ্ঠী অপেক্ষা পরিবারের অধিকতর গুরুত্ব, পূর্বাপেক্ষা নারীর অধিকতর অধীনতা এবং পৈত্রিক সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠাধিকারের অনুরূপ নিয়ম প্রবর্তন উল্লেখ্য।

জাপানী ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—আশিকাগা আমলে সকল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং প্রত্যেক দায়িমিয়ো আপন জমিদারীতে সম্পূর্ণ স্থানীয় স্বাধীনতা লাভ করে। অবশেষে কয়েকজন **অসীম শক্তিসম্পন্ন দাই-মিয়োর** অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহারা সমগ্র দেশে আধিপত্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করে। **ওদা নোবুনাগা** নামে এমন এক শক্তিশালী দায়িমিয়ো

কিয়োতো দখল (১৫৬৮) এবং কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ মঠগুলির সামরিক শক্তি ধ্বংস করিয়া **মধ্য জাপানে প্রভুত্ব স্থাপন** করেন। নোবুনাগার গুপ্তহত্যার (১৫৮২) পর তাঁহার যোগ্যতম প্রধান সেনাপতি **হিদেইয়োশি** তোয়োতোমি **সমগ্র জাপানে সামরিক আধিপত্য** প্রতিষ্ঠা করেন। হিদেইয়োশির মৃত্যুর (১৫৯৮) পর তাঁহারই অন্যতম সামন্ত ও সেনাপতি, তোকুগাওয়া **ইয়েইয়াসু**, জাপানের সর্বময় কর্তা হইয়া **বংশানুক্রমিক তোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্র** (১৬০৩-১৮৬৮) স্থাপন করেন। সম্রাট ও তাঁহার পরিবার, কুজে, সামন্ততন্ত্র ও বাকুফু বজায় রহিল এবং রাজধানী পূর্ব-মধ্য জাপানের **ইয়েদোয়** প্রতিষ্ঠিত হইল। তোকুগাওয়া আমলে শান্তি, শৃঙ্খলা, শক্তিশালী সরকার ও সুদক্ষ শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠা, বুকেদের দেউলিয়াত্ব ও বণিকদের সমৃদ্ধির ফলে পুরাতন সমাজে ভাঙ্গন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে বৈষম্যের ফলে পুরাতন অর্থনীতির ভগ্নদশা **সামন্ততান্ত্রিক জাপানের আধুনিক যুগে প্রবেশের পথ প্রশস্ত** করে। এতদ্ব্যতীত, তোকুগাওয়া নীতির ফলে কন্‌ফুসীয় দর্শনের চর্চা পুনরায় শুরু হইলে সামুরাইদের ব্যবহার-সংহিতা, **বুশিদো** (Bushido, "সৈনিকের জীবনপ্রণালী"), দার্শনিক পরিমার্জনের সাহায্যে বিশেষ পরিবর্তিত হয়। সাহসিকতা, আনুগত্য, কর্তব্যপরায়ণতা, সম্ভ্রম, শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণ বুশিদোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে বুশিদো সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকেও প্রভাবিত করিয়া এক নূতন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে।

তোকুগাওয়া রাজত্বে জাপান দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইলেও সামরিক মানসিকতা অক্ষুণ্ণ রহিল। তাই **সামরিক সামন্ততন্ত্র** ইউরোপে অদৃশ্য হইলেও জাপানে টিঁকিয়া থাকে।

মধ্যযুগে ভারত

গুপ্তোত্তর যুগ (পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী)

ভারতের হূণ আক্রমণ—খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই যাযাবর জাতি চীনের সীমান্তে বাস করিত। পরবর্তীকালে তাহারা ইউচি জাতিকে উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে বিতাড়িত করে। আরো কিছুকাল পর হূণদের এক শাখা অক্সাস্ উপত্যকার দিকে যাত্রা করিয়া **পারস্য** ও **ভারত** অভিমুখে অগ্রসর হয়, অন্যান্য হূণেরা ইউরোপে প্রবেশ করে (৩৭০)। পঞ্চম শতাব্দীতে তাহারা গান্ধার রাজ্য দখল করায় মগধ-সম্রাট প্রথম কুমার-গুপ্তের সময়ে (আঃ ৪১৫-৪৫৫ খ্রীঃ) **উত্তর-পশ্চিম ভারতে** হূণ আক্রমণের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (আঃ ৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ) হূণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে, কিন্তু পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাট এই আক্রমণ প্রতিহত করিলে ভারত আপাততঃ পরাক্রান্ত রোমক সাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য এড়াইতে সমর্থ হয়।

স্কন্দের মৃত্যুর পর হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং পারস্যে সাসানীয় শক্তির অবসান ঘটে (৪৮৪)। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হূণরাজ **তোরমান** কাশ্মীর ও গান্ধার অঞ্চল হইতে নিঃসৃত হইয়া মধ্য ভারতের এরান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র **মিহিরকুলের** (আঃ ৫২০-৫৪২ খ্রীঃ) রাজধানী ছিল শাকলে (শিয়াল-কোট)। মিহিরকুল নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু শাসকের কুখ্যাতি অর্জন করিয়া ভারতের অ্যাটিলা নামে পরিচিত হন। কিন্তু অচিরেই তিনি গুপ্তবংশীয় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ও মালব অধিপতি যশোবর্মণের হস্তে পরাজিত হইলে মধ্য ভারত হূণদের কবল হইতে মুক্তি পাইল। পরাজিত মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর নেতৃহীন হূণেরা উত্তর প্রদেশের শক্তিশালী মৌখরীদের নিকট পরাজিত হয় এবং তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পায়।

সুতরাং পশ্চিমে ঐতিহাসিক রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে সক্ষম হইলেও হূণেরা ভারতে স্থায়ী আধিপত্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়। তথাপি হূণ আক্রমণ ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়; ইহা ভারতের রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। হূণদের আক্রমণের ফলে শুধু যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল তাহা নহে, বহুদিনের জন্য উত্তর ভারতে কোন বৃহৎ শক্তির অধীনে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও ব্যাহত হয়। স্থানীয় রাজন্যবৃন্দের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম হূণদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। হূণ আক্রমণের ধ্বংসলীলায় বহু সমৃদ্ধ নগর ও জনপদ বিনষ্ট হয়, বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে, বৌদ্ধ সংঘারাম ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। হূণেরা অবশ্য ভারতে নূতন কোন শাসন ব্যবস্থার প্রচলন বা নিজস্ব সংস্কৃতির প্রবর্তন করে নাই। তোরমান ও মিহিরকুলের মুদ্রাগুলি প্রাচীন পারসিক, কুষাণ ও গুপ্ত মুদ্রার অনুকরণেই মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে তাহাদের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন ও স্থানীয় রাজবংশগুলির সহিত বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার ফলে ভারতের প্রাচীন সমাজ-বিন্যাস ও জাতি ব্যবস্থায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। শক, পহ্লব ও কুষাণদের ন্যায় বিদেশী বর্বর হূণেরাও এক সময় ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন—বুধগুপ্তের শাসনকাল (৪৭৬-৪৯৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐক্য কিয়দংশে রক্ষিত হইয়াছিল। 'পরবর্তী গুপ্ত'-বংশীয় আদিত্য সেন সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত শক্তির গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ অনেকে স্বাধীন হইয়া যান। সর্বপ্রথম সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে বলভীর মৈত্রকগণ গুপ্ত সার্বভৌম শক্তিকে অস্বীকার করে। ইহার পর মালবের শাসনকেন্দ্র মান্দাসোরের শাসনকর্তা যশোবর্মণ গুপ্ত সম্রাটকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন (৫৩৩ খ্রীঃ)।

গুপ্ত সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যশোবর্মণের এই সাফল্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকার মৌখরীগণ গুপ্ত শক্তিকে অস্বীকার করিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন করে। ঐ সময় বাংলা দেশের গৌড়রাজ্যও স্বাধীন হইল। এইভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

হর্ষবর্ধনের অভ্যুদয়—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে চারটি প্রধান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইল। মগধের গুপ্ত রাজগণ মৌখরীদের আক্রমণে মগধ পরিত্যাগ করিয়া মালব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কনৌজের মৌখরী বংশ ক্রমে মগধ জয় করিল। পূর্ব পাঞ্জাবে থানেশ্বর অঞ্চলে প্রখ্যাত পুষ্যভূতি বংশের অভ্যুদয় ঘটিল। বলভীর মৈত্রকবংশ অন্যান্যদের তুলনায় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।

থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধন তাঁহার রাজ্যকে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। কিন্তু থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন তাঁহার ভগ্নী ও কনৌজ রাজ্যের বিধবা রাণী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া গৌড়রাজ শশাঙ্কের হস্তে নিহত হইলেন। একই সময়ে আকস্মিক ঘটনাচক্রে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসন শূন্য হওয়ায় কনৌজের মন্ত্রীগণ প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র হর্ষবর্ধনকে উভয় রাজ্যের শাসনভার প্রদান করিলেন (৬০৬ খ্রীঃ)। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুতে যে সাম্রাজ্যবাদের অবসান হইয়াছিল প্রায় দেড় শত বৎসর পর হর্ষের সময়ে তাহারই পুনরুত্থান ঘটিল। হর্ষের ইতিহাসের প্রধান উপাদান হইল তাঁহার সভা কবি বানভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' এবং চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণী।



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৪৭ খ্রীঃ) **সাম্রাজ্য**—রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়া হর্ষ

ভগ্নীর নামে কনৌজ রাজ্য শাসন করিতেন এবং অধিকতর কেন্দ্রস্থিত কনৌজ শহরেই তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। দীর্ঘ অভিযানের পর হর্ষ পাঞ্জাব, পূর্ব রাজস্থান ও আসাম অবধি গাঙ্গেয় উপত্যকা সহ উত্তর ভারতের অধিকাংশ জয় করেন। কিন্তু নর্মদা অতিক্রম



হর্ষবর্ধনের কালে ভারতবর্ষ
(৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ)
আনুমানিক সীমানা-----

করিয়া দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলে হর্ষ চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হন। যাহা হউক, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও উড়িষ্যা হর্ষের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এতদ্ব্যতীত, মালব, কাশ্মীর, নেপাল, বলভী ও কামরূপের নৃপতিবৃন্দ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ঐক্যের আদর্শ শুধুমাত্র **উত্তরাপথে** সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, গুপ্ত সাম্রাজ্যের ন্যায় হর্ষের সাম্রাজ্য কেন্দ্রীভূত ছিল না। হর্ষ বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হর্ষ তিনটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ—চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক **হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের** রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করেন। তিনি হর্ষবর্ধনের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যে প্রায় ৮ বৎসর (৬৩৫-৬৪৩ খ্রীঃ) বাস করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙের লিখিত বিস্তৃত ভ্রমণ বৃত্তান্তের নাম **সি-ইউ-কি**। এই সুখপাঠ্য কাহিনী হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

সমাজ ঃ হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তখন পূর্ব ভারত ব্যতীত অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল। বিদেশীর কাছে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল, শিক্ষিত সমাজে দেবভাষা সংস্কৃতের প্রচলন ছিল বেশী এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও এই ভাষা ব্যবহার করিতেন। তবে হিউয়েন সাঙের হিসাবে, দুই লক্ষাধিক ভিক্ষু ও পণ্ডিত কাশ্মীর, জলন্ধর, কনৌজ, বৈশালী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি জায়গায় ৭০০০ বৌদ্ধ মঠে থাকিয়া লেখাপড়ার চর্চা ও ধর্ম আলোচনা করিতেন। তিনি জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যদের প্রতি দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছিলেন; অস্পৃশ্যদের নগরের বাহিরে বাস করিতে হইত। শহরে ধনী ব্যক্তিদের সুনির্মিত ও সুসজ্জিত গৃহ ও দরিদ্র মানুষের সাদাসিধা বাসস্থানের মধ্যে তফাৎ ছিল। অঞ্চল অনুযায়ী জনগণের পরিচ্ছদেরও তফাৎ ছিল। ভারতীয়েরা ঈষৎ হঠকারী ও অস্থিরচিত্ত হইলেও প্রতারণা করিত না। উত্তরভারতে পথঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না এবং চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল; হিউয়েন সাঙ্ দুইবার ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছিল কঠোরতম শাস্তি।

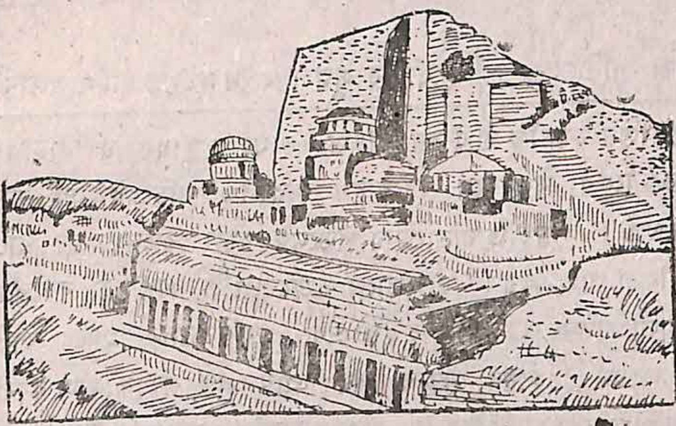
দেশের কৃষিকার্যের অবস্থা ছিল ভাল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও খুব ভালভাবেই



চলিত। বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে চীন ও পূর্ব সমুদ্রগামী বাণিজ্য জাহাজ ছাড়িত।

সংস্কৃতি ঃ পাটলিপুত্রের দক্ষিণে **নালন্দা** নামক স্থানে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। হিউয়েন সাঙ্ স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতের হাজার হাজার বিদ্যানিকেতনের মধ্যে ইহাই সেই যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ছাত্র

শিক্ষালাভের জন্য নালন্দায় সমবেত হইত। বিশাল অট্টালিকাসমূহে ছাত্রগণ অবস্থান করিত। শোনা যায়, বিদ্যায়তনটি পূর্বে ছয়তলা বাড়ী ছিল। নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়িগুলি এখনও ভাল অবস্থায় রহিয়াছে। এখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিত এবং তৎকালে প্রচলিত বৈদিক ও বৌদ্ধ



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

ধর্ম, সাহিত্য, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিত। দেশের ছয়জন রাজা ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তির উপর ছাত্রদের ভরণপোষণের ভার ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে শিক্ষার্থীকে 'দ্বার পণ্ডিতের' প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে হইত এবং ভর্তির পর তাহার জীবন ছিল কঠিন সংযমে বাঁধা। অধ্যাপকগণ সকলেই বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, ইহাদের মধ্যে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, স্থিরমতি ও গুণমতি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। হর্ষের রাজত্বকালে বিখ্যাত বাঙ্গালী মনীষী শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হিউয়েন সাঙ্ তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নালন্দার কাহিনী প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

হিউয়েন সাঙ্ চালুক্য ও পল্লব রাজাদের শিল্প কীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। চালুক্য রাজাদের উৎসাহে বাদামির বিখ্যাত গুহামন্দির নির্মিত

হয়। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকালে পল্লব রাজধানী কাঞ্চীতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র। তিনি মহাবলিপুরমে সমুদ্র তীরে প্রস্তর শিল্পে পল্লবদের বিস্ময়কর কীর্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | হর্ষোত্তর যুগ (অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)

হর্ষোত্তর কনৌজ ও উত্তর ভারত—হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী অর্জুন কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করিলেও অচিরেই এই শাসনের অবসান ঘটে। পুষ্যভূতি সাম্রাজ্যের পতনের ফলে পূর্বতন করদ রাজ্যেরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। রাজস্থানে **গুর্জরেরা** ও কাশ্মীরে **কার্কোটারা** ক্ষমতাশালী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয় এবং আদিত্যসেন মগধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। হর্ষের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দীকাল কনৌজের ইতিহাস অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে **যশোবর্মণ** নামে এক পরাক্রান্ত রাজা মগধ জয় ও দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের পরাস্ত করিয়া কনৌজের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু উত্তর ভারতের প্রাধান্য লইয়া কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের (৭২৪-৭৬০) সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যশোবর্মণ পরাস্ত ও নিহত হন। ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ **ললিতাদিত্যের** অধিকারভুক্ত হয়, কিন্তু কনৌজে কাশ্মীরের আধিপত্য স্থায়ী বা কার্যকরী হয় নাই। ললিতাদিত্যের পৌত্র বিনয়াদিত্য (৭৭৯-৮১০) আয়ুধ রাজাদের শাসিত কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অতঃপর শক্তিশালী পাল রাজা **ধর্মপাল** (৭৭০-৮১০) কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া নিজের মনোনীত চক্রায়ুধকে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলে কনৌজে পাল সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই প্রধানতঃ কনৌজের অধিকার লইয়া পালেরা রাজস্থান ও মালবের গুর্জর-প্রতিহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদের সহিত দীর্ঘ ত্রিশক্তি সংগ্রামে জড়িত হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ কনৌজের অধিকারের উপর নির্ভর করিত। এতদ্ব্যতীত

ব্যাবিলন, রোম ও বাইজেন্টিয়ামের ন্যায় কনৌজের গৌরব এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতিমাত্রই এই নগরটি অধিকার করতে সচেষ্ট হন।

ত্রিশক্তি সংগ্রাম—পাটলিপুত্রের পরিবর্তে কনৌজ আর্যাবর্তে রাজনৈতিক গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় ঐ নগরীর নিয়ন্ত্রণ লইয়া যে সংগ্রাম শুরু হয়



তাহাই হর্ষোত্তর উত্তর ভারতের প্রধান ঘটনা। এই ত্রিশক্তি সংগ্রামে প্রতিহারেরা অবশেষে জয়ী হইয়া পুষ্যভূতিদের তুলনায় অধিকতর স্থায়ী ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

প্রতিহাররাজ **দ্বিতীয় নাগভট** (৮০৫-৮৩৩) ধর্মপালের আশ্রিত কনৌজরাজ চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া কনৌজ দখল এবং পাল রাজাকে পরাস্ত করেন। ঐ সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলে উত্তর ভারতে ধর্মপালের সর্বময় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিল এবং কনৌজ রাজ্য পাল প্রাধান্য স্বীকার করে। **নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ** পর্যন্ত পালেদের এই প্রাধান্য বজায় ছিল। অতঃপর **মিহির ভোজের** (৮৩৬-৮৫৮) আমলে প্রতিহার শক্তির **পুনরুত্থান** হয়। তিনি কনৌজে রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি বিশাল **সাম্রাজ্যের** অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পশ্চিমে কাথিয়াওয়াড় হইতে পূর্বে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভোজের পুত্র **মহেন্দ্রপালের** সময়ে (৮৮৫—৯১০) প্রতিহার সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া বিস্তৃতির চরম শিখরে উঠিল। কিন্তু ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট নৃপতি **তৃতীয় ইন্দ্র** (৯১৫—৯১৭) প্রতিহাররাজ মহীপালকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করিয়া সাময়িকভাবে কনৌজ অধিকার করেন। ইহার পর হইতে প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের গতি ত্বরান্বিত হয়। **দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে** রাষ্ট্রকূট আক্রমণের চাপে দ্বিতীয় কনৌজ সাম্রাজ্যটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

রাজপুত যুগ—প্রতিহারদের পতনে প্রথম রাজপুত সাম্রাজ্যের অবসান হইলেও বিন্ধ্যের উত্তরবর্তী ভারতে রাজপুত প্রভুত্বের অবসান ঘটে নাই। বস্তুতঃ হর্ষের মৃত্যু ও সুলতানী শাসনের অন্তর্বর্তী পাঁচ শতাব্দীর অধিক সময়ে রাজপুতেরাই ছিল পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রধান শক্তি। প্রতিহার সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ হইতে যে স্বাধীন রাজ্যগুলির উৎপত্তি হয় তাহাদের অধিকাংশই ছিল রাজপুত-শাসিত। প্রতিহারোত্তর যুগে বিভিন্ন শক্তি প্রতিহারদের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

রাজপুতদের উৎপত্তি কিছুটা রহস্যাবৃত। হূণদের সহিত মধ্য এশিয়ার গুর্জর প্রভৃতি আরো কয়েকটি জাতি-উপজাতি ভারতে প্রবেশ ও বসতি স্থাপন করে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন, এইসব বিদেশী জাতিগুলি হইতেই

পরবর্তীকালে কয়েকটি বিখ্যাত রাজপুত গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। রাজপুত রাজারা নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার করিতে যেরূপ অহেতুক উৎসাহ দেখান এবং ব্রাহ্মণ সমাজ যে ভাবে তাঁহাদের পৌরানিক সূর্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত বলিয়া সামাজিক মর্যাদা দিবার চেষ্টা করেন তাহাতেই সন্দেহ হয় যে তাঁহারা আদিতে বৈদেশিক জাতি ছিলেন। **প্রতিহার** (বা পরিহার), **চৌহান** (বা চহমান), **চৌলুক্য** (বা সোলাঙ্কি) এবং **পরমার** (বা পাওয়ার) এই চারটি প্রধান রাজপুত গোষ্ঠী নিজেদের যজ্ঞাগ্নি-উদ্ভূত পুরুষের বংশধর বলিয়া প্রচার করে। এই অলৌকিক কাহিনী প্রচারের প্রয়োজনও হইয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাদের বৈদেশিক উদ্ভবের তথ্য গোপন করিবার জন্য। এতদ্ব্যতীত, রাজপুতদের **আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক শাসন পদ্ধতি** ছিল অতি উন্নত প্রাচীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজপুত শাসন প্রণালীর মারাত্মক দুর্বলতা হইল এই যে রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত শাসক গোষ্ঠীর বহির্ভূত জনসমষ্টির স্বার্থের বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল না।

'অগ্নিকুল' রাজপুত গোষ্ঠীগুলি পশ্চিম ভারত এবং মধ্য ভারত ও রাজস্থানের কিয়দংশে তাহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিহারেরা দক্ষিণ রাজস্থানে, চৌহানেরা পূর্ব-মধ্য রাজস্থানে, চৌলুক্যেরা কাথিয়াওয়াড়ে এবং পরমারেরা মালবে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে। অন্যান্য রাজপুত শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের **চন্দেল্ল** বংশ, মেবারের **গুহিলা** বংশ, বর্তমান হরিয়ানা অঞ্চলের **তোমার** বংশ এবং জববলপুরের নিকট ত্রিপুরীর **কলচুরী** বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তোমার রাজপুতেরাই ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান দিল্লী নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। অন্যান্য নগণ্য শাসকেরাও শক্তি সঞ্চার করিয়া ক্রমে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলে। ইহাদের মধ্যে নেপাল, কামরূপ, উৎকল (উড়িষ্যা) ও পাঞ্জাবের পার্বত্য রাষ্ট্রগুলি উল্লেখ্য। কিন্তু ইহারা রাজপুত ইতিহাসের বহির্ভূত ছিল।

রাজপুত রাজ্যবর্গের সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রচেষ্টা—চন্দেল্লরাই সম্রাজ্যবাদী ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম দৃঢ় প্রচেষ্টা করে। অন্যান্য অনেক অধীন জাতির ন্যায় চন্দেল্লরা প্রতিহারদের দুর্বলতার সুযোগে শক্তিশালী **ধঙ্গের** (৯৫৪—১০০৮) নেতৃত্বে স্বাধীন হয়। **বিদ্যাধরের** (১০১৭—১০২৯)

রাজ্যশ্রীর সহিত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণের বিবাহসূত্রে কনৌজ ও থানেশ্বরের মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার বিরুদ্ধে শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া একটি বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গঠন করেন। মৌখরীগণ গৌড়ের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়া শশাঙ্ক দেবগুপ্তের কনৌজ আক্রমণে সহায়তা করিলেন। গ্রহবর্মণ নিহত ও রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধা হইলে থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করিয়া কনৌজ জয় করিলেন ; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই শশাঙ্কের হস্তে তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইল। অতঃপর হর্ষ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল পূর্ব ভারতে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ ও হর্ষবর্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (আঃ ৬৩৭ খ্রীঃ) শশাঙ্ক সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ, মগধ, পূর্ববঙ্গ এবং উৎকল দেশের (কঙ্গোদ পর্যন্ত) অধিপতি ছিলেন। কনৌজ-থানেশ্বর-কামরূপ উত্তর ভারতের এই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে সার্থক ভাবে যুদ্ধ করিয়া এবং সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শশাঙ্ক অসামান্য সামরিক কীর্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সপ্তম শতকের মধ্যভাগে শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল।

পাল যুগের গুরুত্ব—শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দীকাল বৈদেশিক আক্রমণ ও রাজনৈতিক অনৈক্যের ফলে বাঙ্গালী জনসাধারণ মাৎস্যন্যায়ে পীড়িত হয়। বাহুবলের উৎপীড়ন অসহ্য হইলে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ গোপালদেব নামে এক সুদক্ষ ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করিয়া তাঁহার সর্বময় প্রভুত্ব স্বীকার করেন।

পাল বংশের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসের এক পরম গৌরবময় যুগ। গণ-নির্বাচনের মাধ্যমে পাল রাজবংশের ক্ষমতালাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তদানীন্তন ভারতে একমাত্র এই রাজবংশই প্রায় চার শতাব্দী কাল (**অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী**) শাসন করিয়াছিল। পাল যুগেই বাঙ্গালী জাতি উত্তর ভারতে রাজনৈতিক প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এতদ্ব্যতীত, বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই যুগে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

পাল যুগে সমাজ ঃ উপজীবিকা ও শ্রেণীবিভাগ—প্রাচীন বাংলায় অর্থাগমের উপায় ছিল তিনটি—**কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য**। সামাজিক ধনের উৎপাদন অনুসারে সমাজের **অর্থনৈতিক শ্রেণীর** স্তরভেদ দেখা দেয়। পাল বাংলার ধনদৌলত আসিত প্রধানতঃ কৃষি হইতে। কৃষিকার্য বাঙ্গালীর প্রধান উপজীবিকা হইলেও বস্ত্রশিল্প, কারুশিল্প, লৌহশিল্প ও মৃৎশিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। দেশ-বিদেশ জোড়া ব্যবসাবাণিজ্য হইতেও প্রাচীন বাংলায় প্রচুর অর্থাগম হইত। কিন্তু অষ্টম শতকের সূচনা হইতেই বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসাবাণিজ্য আরব ও পারসিক বণিকদের হস্তে চলিয়া যায়। ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতির ফলে শিল্প প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটিল। কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার ফলে পাল আমলের শেষভাগে বাংলাদেশ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর গ্রাম্যসমাজে পরিণত হয়। অষ্টম শতক হইতে শিল্প-ব্যবসা-বণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শিল্পী-ব্যবসায়ী-বণিকদের মর্যাদা, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া যায়। সমাজ ক্রমেই কৃষিনির্ভর হওয়ায় সেখানে কৃষক উচ্চস্থান অধিকার করেন।

বর্ণবিভাগ—প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজ যেমন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে, তেমনি বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধ পালরাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা পুরোপুরি স্বীকৃত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতকের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ ম্লেচ্ছদের লইয়া গঠিত বাংলার বর্ণবিন্যাসের মোটামুটি কাঠামো গড়িয়া উঠে। নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে কায়স্থেরা বর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন এবং একাদশ-দ্বাদশ শতক হইতে বৈদ্যবৃত্তিধারীগণ বৈদ্য উপবর্ণ রূপে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পাল রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের প্রভাব সর্বাধিক হইলেও ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের আদর্শ ছিল উদার ও নমনীয়।

নারীসমাজ—বাংলার পাল আমলের লিপি হইতে মনে হয় লক্ষ্মীর মত কল্যাণী, বসুন্ধরার মত সর্বংসহা, পাতিব্রত্যে অচঞ্চল নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙ্গালী নারীর আদর্শ। অভিজাত সমাজে ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু-বিবাহের প্রচলন থাকিলেও একটিমাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সেকালকার

সাধারণ নিয়ম। সবর্ণে বিবাহ সাধারণ নিয়ম হইলেও অসবর্ণ বিবাহ প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। সে যুগে মেয়েদের নিকট বৈধব্য ছিল জীবনের চরম অভিশাপ। বিধবাদের নিতান্ত সাদাসিধাভাবে সংযত জীবন যাপন করিতে হইত এবং তাহারা সাধারণতঃ উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিত না।

জীবনচিত্র ঃ প্রাচীন বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় না।

সাজসজ্জা—ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙ্গালীর প্রধান বেশবাস। তবে অবস্থাপন্ন পরিবারে পুরুষেরা ব্যবহার করিত সেলাইবিহীন উত্তরীয়, মেয়েরা ওড়না। কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ুর, শঙ্খবলয়, মেখলা—এই সকল অলঙ্কার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিত। স্বর্ণ-রৌপ্যের গহনা ব্যতীত হীরক-খচিত নানা সুন্দর অলঙ্কার, এবং মুক্তা, নীলকান্ত মণি, চুনি প্রভৃতি রত্নের ব্যবহার ছিল।

পানাহার—ভাতের সঙ্গে সাধারণত শাকসব্জী, তরি-তরকারি খাওয়াই ছিল প্রাচীনকালের বাঙ্গালীর নিয়ম। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়া-মাটির বিভিন্ন ফলকে বাঙ্গালীর মৎস্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের সকল স্তরে ছাগমাংস খাওয়ার প্রথা ছিল। ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঁটাল, নারিকেল ও আখের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুধ, ডাবের জল, আখের রস, তালরস ব্যতীত মদ্যজাতীয় নানা রকম পানীয় প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল।

আমোদ-প্রমোদ—পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকে শিকারের কিছু কিছু দৃশ্য দেখা যায়। ক্রমে দাবা ও জুয়া খেলার চলন হয়। রাজপরিবারে ও অভিজাত সমাজে হস্তী ও অশ্ব ক্রীড়ার যথেষ্ট চলন ছিল। সমসাময়িক সাহিত্য ও নানা লিপিতে নৃত্য-গীত-বাজনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাল যুগে ধর্ম—বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পূর্ব ভারত হয় ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও তাঁহাদের পরমতসহিষ্ণুতা ছিল ; তাঁহাদের সময়ে

হিন্দুধর্মের অবনতি ঘটে নাই। বরং পাল-পর্বের শেষভাগে বৈদিক ধর্ম আরো প্রসারিত হয় এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম জয়লাভ করে। পাল আমলে বেদ ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পাল রাজাদের অনেকে ব্রাহ্মণ্য রাজপরিবারে বিবাহ করায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। পাল যুগের রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

পালরাজারা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তারে অশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল মহাবিহারের মধ্যে বিহার রাজ্যের অন্তর্গত ওদন্তপুরী এবং ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল বিহার ও সোমপুর বিহার বিশেষ প্রসিদ্ধ। পাল রাজবংশের সক্রিয় পোষকতায় বৌদ্ধধর্ম অষ্টম হইতে একাদশ শতকের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করে। তিব্বত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তারে যে সকল বৌদ্ধ পণ্ডিত ও প্রচারক সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শান্তরক্ষিত, পণ্ডিত ধর্মপাল, ধর্মকীর্তি, বিমলমিত্র, শান্তিগর্ভ, পদ্মসম্ভব, কমলশীল ও **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের** (৯৮০-১০৫৩) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নালন্দা মহাবিহারের অন্যতম আচার্য শান্তরক্ষিতের খ্যাতি ভারতের বাহিরেও প্রসারিত হয়। ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষিত হইয়া এবং বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি লাভ করিয়া দীপঙ্কর দীর্ঘকাল সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন। বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য থাকাকালীন দীপঙ্কর তিব্বতের বৌদ্ধ রাজপরিবারের বিশেষ আমন্ত্রণে সেখানে গিয়াছিলেন।

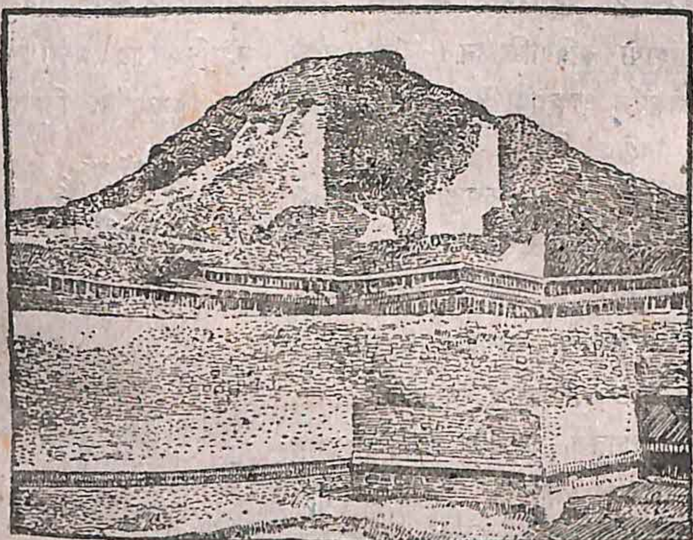


দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

পালযুগে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম ক্রমশই বিকৃত হইয়া যায়। বৌদ্ধ সমাজে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রবল হইয়া উঠিল, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক

ভিত্তি শক্তিপূজার আড়ালে চাপা পড়িয়া গেল। তান্ত্রিক সহজিয়া সাধুগণ বৌদ্ধধর্মকে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে প্রচার করিলেন।

পালযুগে শিক্ষা—বহুখ্যাত বৌদ্ধ বিহারগুলির মাধ্যমে পালযুগে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল। ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত **বিক্রমশীল মহাবিহারে** মোট ১০৭টি মঠ ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। মোট ১১৪ জন অধ্যাপক এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। অভয়ঙ্কর গুপ্ত, অতীশ



সোমপুর মহাবিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

দীপঙ্কর প্রভৃতি বাঙালী পণ্ডিত বিক্রমশীলের মহাচার্য ছিলেন। এখানে প্রায় ৩০০০ ছাত্রের অধ্যয়ন ও বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। এই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে তিব্বত, নেপাল, সুবর্ণভূমি প্রভৃতি দূর দেশ হইতে ছাত্র আসিত। এখানে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় পঠিত হইত। বিক্রমশীলের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র, এমন কি ভারতের বাহিরেও, বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। শিক্ষার উন্নতিকল্পে পালরাজাদের আর একটি মহান কীর্তি হইল **ওদন্তপুরী মহাবিহার** স্থাপন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বিষয় পড়াইবার সুব্যবস্থা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে ছাত্রদের

যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হইত। যোগ্যতার প্রমাণ দিলে তাহারা বিনা বেতনে পাঠ করিতে পারিত। কিছুকাল পূর্বে ভূগর্ভ হইতে উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত পাহাড়পুরে **সোমপুর মহাবিহারের** ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্য বিহারের মত সোমপুর বিহারও ছিল আবাসিক। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় ঐগুলি ছাত্র ও অধ্যাপকদের বসবাসের জন্যই ব্যবহৃত হইত।

পাল যুগের পাণ্ডিত্য—পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। শিক্ষিত সমাজের উচ্চস্তরে সংস্কৃত ভাষার একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। বাঙ্গালী পণ্ডিত **ভবদেব ভট্ট** ও **জীমূতবাহনের** রচনায় **সংস্কৃত সাহিত্য** সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, নবম-দশম শতক নাগাদই লোকগীতির মাধ্যমে **বাংলা ভাষার** জন্ম হয়। পাল আমলে বৌদ্ধ আচার্যগণ তান্ত্রিক সহজিয়া ধর্ম সম্বন্ধে অনেক পদাবলী রচনা করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে এইরূপ কতকগুলি **চর্যাপদ** সংগ্রহ করেন। চর্যাগীতির গানগুলিই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে স্বীকৃত। **ঐতিহাসিক কাব্য** রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন **সন্ধ্যাকর নন্দী**। তাঁহার রচিত 'রামচরিত' কাব্যতে কৈবর্ত বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক পাল সিংহাসন পুনরুদ্ধারের বিবরণ থাকায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। পাল যুগের সর্ব-ভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন **চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্**দের মধ্যে ছিলেন **চক্রপাণি দত্ত**। তাঁহার রচিত 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' হইল ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ।

সেনযুগের গুরুত্ব—দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পালবংশ হীনবল হইয়া পড়িলে বাংলায় সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন রাজাদের প্রায় দেড়শত বৎসরের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের ন্যায় দক্ষ ও ক্ষমতাশালী রাজন্যবর্গ রাজনৈতিক অরাজকতা দূর করিয়া সমগ্র প্রদেশকে একটি সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সেন রাজারা হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নূতন প্রেরণা ও জীবন সঞ্চার করেন।

সেনযুগে সমাজ ঃ শ্রেণীবিভাগ—সেন আমলে কৃষি বাঙ্গালীর প্রধান উপজীবিকা হওয়ায় সমাজ ক্রমশঃ ভূমিনির্ভর ও কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িল এবং শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীরা সমাজের নিম্নস্তরে স্থান পাইল।

বর্ণবিভাগ—কর্ণাটক ব্রাহ্মণবংশীয় সেনরাজারা ছিলেন অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থনে বাঙ্গালী সমাজ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠিত হইল। ব্রাহ্মণ বর্ণের একাধিপত্য সেন যুগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সেন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা রাজপুরুষ হিসাবে দেখা দিলেন, তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইল, তাঁহারা অগাধ জমির মালিক হইলেন। সেন-রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন চেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিন্যাসের আদর্শ হইল সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট। ব্রাহ্মণতান্ত্রিক বর্ণব্যবস্থার শীর্ষে রহিলেন ব্রাহ্মণেরা। তাঁহাদের পর রাষ্ট্রে কায়স্থদের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। বৈদ্যদেরও কিছু প্রভাব ছিল। বল্লাল সেন জাতিভেদকে মজবুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য-বর্ণের বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে **কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন** করেন। সামাজিক ব্যাপার, বিবাহ প্রভৃতিতে কুলীন সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষ রীতিনীতি মানিয়া চলিতে হইত।

সেন যুগে ধর্ম—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একাধিপত্যের আদর্শে গঠিত সেন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার হইল এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের দ্রুত বৃদ্ধি হইল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতি জানিতেন না বলিয়া বাহির হইতে বেদজ্ঞ বৈদিক ব্রাহ্মণদের আনা হইল। বল্লাল সেন নেপাল, ভূটান, আরাকান প্রভৃতি দেশে হিন্দুধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন।

সেন পর্বে বাংলাদেশে জৈন ধর্মের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাবও ক্রমশই হ্রাস পায়। বৌদ্ধ বিহারগুলির অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি লুপ্তপ্রায় হইল। সেনরাজারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরাগ ও তাচ্ছিল্য পোষণ করিতেন। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া গেল।

সেন যুগের পাণ্ডিত্য—সেনযুগে বিদ্যা চর্চা অব্যাহত ছিল। **বল্লাল সেন** স্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ করিয়া পাঁচখানি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মধ্যে 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ দুইটি এখনও বিদ্যমান। বল্লালের গুরু এবং প্রেরণাদাতা **অনিরুদ্ধ ভট্ট** ছিলেন সে যুগের একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত। **লক্ষ্মণ সেন** বিদ্যোৎসাহী এবং সুকবি ছিলেন। তিনি পিতার রচিত অসমাপ্ত 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। যে কয়জন বিশিষ্ট কবি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া **সংস্কৃত সাহিত্য** সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন **ধোয়ী**, **জয়দেব**, শরণ, গোবর্ধন, শ্রীধর দাস ও উমাপতি ধর। ধোয়ীর সংস্কৃত কাব্য 'পবনদূত' কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচিত। কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন করিয়া সরল সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' গীতিকাব্যটি রচনা করেন। ভাব ও সুরের মাধুর্যের জন্য গীতগোবিন্দ আজও ভারতের সর্বত্র সমাদৃত হয়। লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধ্যক্ষ ও ভারত-বিখ্যাত মনীষী, **হলায়ুধের** রচিত 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' নামক ধর্ম গ্রন্থে বেদ মন্ত্র ও বৈদিক অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা আছে। এক কথায়, পাল আমলে বাঙ্গালী প্রতিভার যে প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল উহা সেনযুগেও অব্যাহত ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | দক্ষিণ ভারত (ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল ইহাদের মধ্যে **চালুক্য রাজ্য** প্রাচীনতম। ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চালুক্য ও পল্লবশক্তির মধ্যে আধিপত্য স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। অতঃপর **রাষ্ট্রকূট শক্তি**

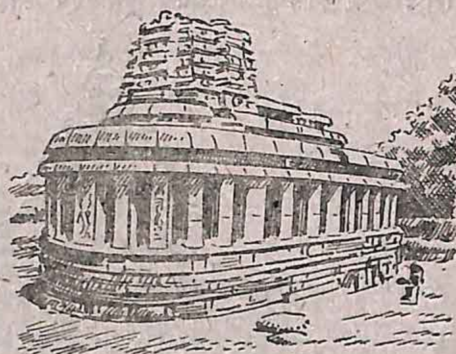
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা করে। অবশেষে **চোল** শক্তি দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উহা বজায় রাখে।

চালুক্য শক্তির রাজনৈতিক ইতিহাস—চালুক্য রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **প্রথম পুলকেশী** (৫৩৫-৫৬৬ খ্রীঃ)। তিনি বর্তমান মহারাষ্ট্রের বিজাপুর জেলায় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া **বাতাপি** (আধুনিক বাদামি) নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর **মঙ্গলেশ** (৫৯৭-৬১০) মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলা ও উত্তর দাক্ষিণাত্য জয় করেন। **দ্বিতীয় পুলকেশী** (৬২০-৬৪২) ছিলেন চালুক্য বংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা। দক্ষিণ গুজরাট, মালব, কোঙ্কন, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চল তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পল্লব-রাজ মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করিয়া সসৈন্যে পল্লব রাজধানী কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হন। কাবেরী নদীর দক্ষিণস্থিত চোল, কেরল ও পাণ্ড্য রাজ্য তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল। এইরূপে দাক্ষিণাত্যের এক বৃহৎ অংশে চালুক্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাক্রান্ত কনৌজ-রাজ হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইলে পুলকেশী তাঁহাকে পরাস্ত করেন। হিউয়েন-সাঙ্ পুলকেশীর শক্তি ও ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পুলকেশী পল্লব-রাজ নরসিংহবর্মণ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন এবং বাতাপি পল্লববাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়।

কিছুকাল পরে পুলকেশীর উত্তরাধিকারী **প্রথম বিক্রমাদিত্য** (৬৫৫-৬৮১) পল্লবদেব পরাজিত করিয়া পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। **দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য** (৭৩৩-৭৪৬) পল্লব-রাজধানী বিধ্বস্ত করেন এবং দক্ষিণ গুজরাট হইতে আরব আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করেন। চোল, পাণ্ড্য ও কেরলরাজগণ পুনরায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী চালুক্য-পল্লব প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয় বংশের ক্ষমতা হ্রাস পায়। **দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ** (৭৪৬-৭৫৭) রাষ্ট্রকূটদের নিকট পরাজিত হইলে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যদের পরিবর্তে রাষ্ট্রকূট প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

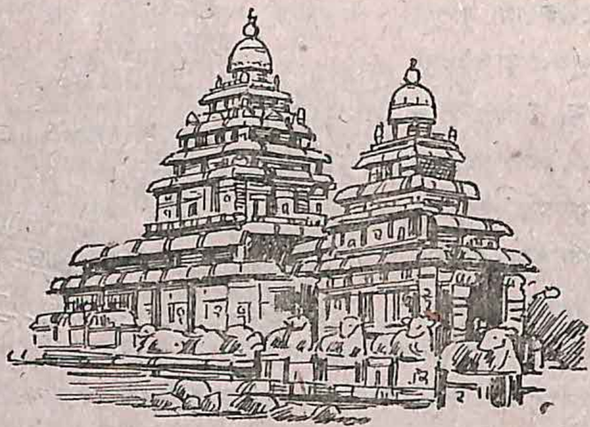
চালুক্য সংস্কৃতি—চালুক্য রাজগণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং মন্দির নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন। এই সময়েই পর্বত-গাত্র ক্ষোদিত করিয়া **গুহা-মন্দির** নির্মাণের রীতি সুপ্রচলিত হয়। বাদামির

সন্নিকটে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কয়েকটি মনোরম গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। আইহোলের দুর্গা মন্দির হইল চালুক্য স্থাপত্যের অন্যতম সুপ্রাচীন নিদর্শন। এই যুগের **প্রস্তর মন্দির** সমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য সঙ্গমেশ্বর এবং বিরূপাক্ষদেবের মন্দির দুইটি। বাদামির গুহা-মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। অজন্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র সম্ভবতঃ চালুক্য যুগেরই সৃষ্টি।


আইহোলের দুর্গা মন্দির

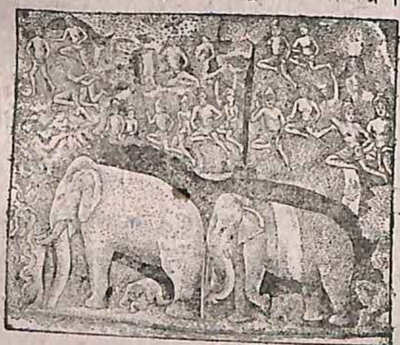
পল্লব শক্তির রাজনৈতিক ইতিহাস—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে 'সুদূর দক্ষিণ' ভারতের পূর্ব উপকূলে পল্লব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লবগণ দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করিয়া কিছুকাল সার্বভৌম অধিকার ভোগ করিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে পল্লব-রাজ **সিংহবিষ্ণু অবনিসিংহ** কাবেরী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী **মহেন্দ্রবর্মণের** (৬০০-৬৩০ খ্রীঃ) রাজত্বকালে পল্লব-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। **নরসিংহবর্মণ** (৬৩০-৬৬৮) পুলকেশীকে ক্রমান্বয়ে তিনবার পরাজিত করিয়া এবং চালুক্য-রাজধানী বাতাপি অধিকার করিয়া পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিউয়েন্ সাঙ পল্লব-রাজ্য ভ্রমণ করিয়া ইহার অধিপতি ও জনগণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। **পরমেশ্বরবর্মণের** (৬৭০—৬৯৫) রাজত্বকালে পল্লব-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুনরায় দেখা দেয়। **নন্দীবর্মণের** (৭৩০—৭৯৫) আমলে পল্লব-রাজধানী কাঞ্চী সাময়িকভাবে চালুক্যদের অধিকারভুক্ত হয়। অবশেষে ৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে চোলরাজ প্রথম আদিত্য **অপরাজিতবর্মণকে** পরাজিত করিয়া পল্লব-রাজ্য অধিকার করেন।

পল্লবযুগের শিল্প—পল্লব রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগেই



মহাবলিপুরমের মন্দির

পাথর কাটিয়া মন্দির গঠনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। মহাবলিপুরমের বিশাল মন্দির নির্মিত হইয়াছিল নরসিংহ বর্মণের সময়ে। তিনিই রথের আকৃতিবিশিষ্ট সাতটি অনুপম মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মহাবলি-



পর্বতগাত্রে খোদিত শিল্প কার্য

পুরমের মন্দিরগাত্রে খোদিত সুন্দর মূর্তিগুলি পল্লব ভাস্কর্যের উৎকর্ষতার নিদর্শন। পাথর কুঁদিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত পল্লব শিল্পীগণ মর্ত্যে গঙ্গাবতরণের সমগ্র দৃশ্যটি রেখাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা শিল্পরসিক সমাজে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। কাঞ্চী এবং অন্যান্য স্থানে পল্লব রাজগণের নির্মিত বহু সুদৃশ্য মন্দির তাঁহাদের শিল্পানুরাগের এবং ধর্ম-প্রাণতার পরিচয় দেয়।

চোল শক্তি ঃ সামুদ্রিক দিগ্বিজয়—অশোকের সময়ে দ্রাবিড় দেশে যে চারটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী

ছিল চোল রাজ্য। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দাক্ষিণাত্যে পল্লব প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় চোল রাজ্যের প্রভাব হ্রাস পায়। নবম শতাব্দীতে বিজয়ালয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে চোল শক্তির পুনরুত্থান ঘটে। পরান্তকের (৯০৭-৯৫৫) রাজত্বকালে চোল রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তিনি **সিংহল** আক্রমণ করিয়া বিফল হন। চোল বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন **প্রথম রাজরাজ** (৯৮৫-১০১৬)। তিনি কেরল-রাজ্য, পাণ্ড-রাজ্য ও মহীশূরের কিয়দংশ অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ কলিঙ্গ জয় করেন। রাজরাজ সমুদ্রপথে ক্ষমতা বিস্তারের এবং ভারতের সহিত পশ্চিম এশিয়ার অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে আনিবার আর্থিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিয়া সিংহলের উত্তরাংশ এবং **লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ** অধিকার করেন। এইরূপে চোল সাম্রাজ্য আংশিকভাবে সামুদ্রিক রূপ ধারণ করিল। পরবর্তী চোল-রাজ **প্রথম রাজেন্দ্র** (১০১৬-১০৪৪) চোল-সাম্রাজ্যকে গৌরবের উচ্চতম শিখরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র সিংহল অধিকার করেন এবং রাষ্ট্রকূট রাজগণের মত আর্যাবর্তে প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াসী হন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌ-অভিযান হইল রাজেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ চীনের সহিত ভারতের লাভজনক বাণিজ্য করায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পরাক্রান্ত নৌ-বাহিনীর সাহায্যে **আন্দামান** ও **নিকোবর** দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের কতকাংশ এবং **সুমাত্রা ও মালয়ের** কিয়দংশ অধিকার করেন। ভারতের আর কোন রাজা সমুদ্রপথে এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই আধিপত্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। কুলোত্তুঙ্গের (১০৭০—১১২২) আমলে সাগরপারে অধিকৃত রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতঃপর পাণ্ড্যদের আক্রমণে চোল রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে উহার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও করদ রাজাগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

ভূমিকা—অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্য-বিস্তার, বসতি স্থাপন এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে বহির্জগতের সহিত ভারতের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে পশ্চিম ও মধ্য-



ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

এশিয়ার সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল। সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে জনৈক গ্রীক নাবিক জলপথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ হইতে

ভারতের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা জানা যায়। ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সুপ্রচলিত ছিল।

ভারত ও মধ্য এশিয়া—কুষাণ যুগে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। কণিষ্ক সেখানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্নকে প্রেরণ করেন। বহু ভারতীয় খোটান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্ মধ্য এশিয়ার পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশকালে ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত স্যার অরেল স্টাইন মধ্য এশিয়ায় যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আছে অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠের ধ্বংসাবশেষ, বুদ্ধমূর্তি ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি এবং ভারতীয় ভাষা ও অক্ষরে লিখিত বহু পুস্তকের পাণ্ডুলিপি। খোটানে যে সকল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রায় দেড় হইতে দুই হাজার বৎসর আগেকার। এইগুলি 'খরোষ্ঠি' অক্ষরে লেখা বুদ্ধের ধর্মোপদেশের সারাংশ। খোটানের অদূরে সংস্কৃতে লেখা চিকিৎসাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং খোটান, কুচা প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সন্দেহাতীত।

ভারত ও পূর্ব এশিয়া—মধ্য এশিয়া হইতে বৌদ্ধ ধর্ম চীনদেশে প্রসারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচীন চৈনিক সভ্যতাকে বিশেষ প্রভাবিত করে। বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক ও মূর্তি সংগ্রহের জন্য এবং ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু চীনা ধর্মোৎসাহী ব্যক্তি স্থলপথে ও জলপথে ভারতে আগমন করেন। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ ও ইৎ-সিং-এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশ্যপ মাতঙ্গ, কুমারজীব, পরমার্থ প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতগণও ধর্ম প্রচারের জন্য চীনে গিয়াছিলেন। কুমারজীব চৈনিক ভাষায় অশ্বঘোষ, নাগার্জুন ও বসুবন্ধুর গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন। ভারত এবং চীনের মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধও ছিল। চীন হইতে বৌদ্ধ ধর্ম কোরিয়া ও জাপানে

প্রচারিত হয়। গত দেড় হাজার বৎসরে বৌদ্ধ ধর্ম চীন ও জাপান এই উভয় দেশের সভ্যতাকেই সম্যক্ প্রভাবিত করিয়াছে।

ভারত ও তিব্বত—সপ্তম শতাব্দীতে রাজা স্ট্রং-সান গাম্পো তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের ও খোটানে প্রচলিত ভারতীয় অক্ষরের প্রবর্তন করেন। পাল রাজাদের সহিত তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; তাঁহারা তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধনে সহয়তা করেন। অসংখ্য তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু নালন্দা ও বিক্রমশীলায় অধ্যয়ন করিতেন এবং **অতীশ দীপঙ্কর** (একাদশ শতাব্দী) প্রমুখ বহু ভারতীয় বৌদ্ধ দার্শনিক ও শ্রমণ তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় বহু মূল বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। আজও তিব্বতীরা দীপঙ্করকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

ভারত ও সিংহল—'দেবানাং প্রিয়' তিস্‌সের রাজত্বকালে অশোক কর্তৃক প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণ সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন। সিংহলী ভাষা আর্য ও দ্রাবিড় ভাষার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। সিংহলের অনুরাধাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ভারতীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক সম্যক্ প্রভাব লক্ষিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা—স্থলপথে বিস্তৃত হয় ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাব, সমুদ্রযোগে প্রসারিত হয় উহার রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব। বহু ছোট-বড় দেশ ও দ্বীপ এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। প্রাচীনকালে ভারতীয়গণ এই অঞ্চলকে **সুবর্ণভূমি** নামে অভিহিত করে। ইহার উর্বর মাটি ও প্রচুর খনিজ সম্পদের জন্যই বোধহয় এই নামকরণ হয়।

ভারত ও ব্রহ্মদেশ—ব্রহ্মদেশীয় কিংবদন্তী অনুসারে বুদ্ধদেবের সময় হইতে ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশের উপকূলে এবং অভ্যন্তরে বহু ভারতীয় বসতি ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। **শ্রীক্ষেত্রে** ভারতীয় হিন্দুরাজগণ রাজ্য স্থাপন করেন। মধ্য ব্রহ্মে অবস্থিত **পাগান** রাজ্যের বিখ্যাত রাজা অনিরুদ্ধ ধর্মদর্শী নামক প্রচারকের দ্বারা 'থেরবাদ' (হীনযান) বৌদ্ধ ধর্মে

দীক্ষিত হইয়া ঐ ধর্ম প্রচারে সহায়তা করেন। এই রাজ্যে অবস্থিত আনন্দ মন্দিরের গঠন প্রণালী ও শিল্পকার্য দেখিয়া মনে হয় যে উহা ভারতীয় স্থপতিদের দ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত ভারতীয় শৈব, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্মমত ব্রহ্মের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে। পালি ভাষার সহিত ব্রহ্মদেশীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ব্রহ্মের লিপিও ভারতীয় লিপির পরিবর্তিত রূপ। এক কথায় ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

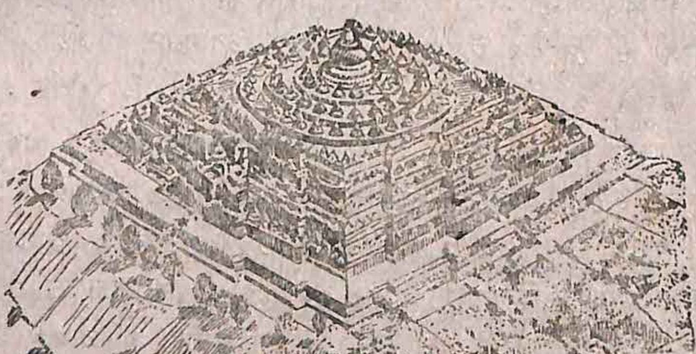
ভারত ও শ্যাম—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে শ্যাম রাজ্যের সহিত ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়। ভারতীয়গণ শ্যামরাজ্যে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করে। কিংবদন্তী অনুযায়ী মগধ হইতে এই রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যেও শ্যামদেশে বদ্ধমূল হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন হইতে আগত 'তাই' জাতি শ্যামদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। আজও এই দেশে হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারত ও সুবর্ণভূমির অন্যান্য দেশসমূহ : ইন্দোচীন, মালয় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সমৃদ্ধ দেশগুলির সহিত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাক্কালেই ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর অন্তর্বর্তী সময়ে মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম এবং সুমাত্রা, জাভা, বলি ও বোর্ণিও দ্বীপগুলিতে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তিপূর্ণ বসতি স্থাপনের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম, সামাজিক আচার ও রীতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতি এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত হয়। এখনও মালয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুমাত্রায় শ্রীবিজয় নামে একটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইহা বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ এই রাজ্যটিকে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুমাত্রায় হিন্দু জাতিভেদ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোর্ণিয়ো দ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মই ছিল প্রধান ধর্ম এবং ব্রাহ্মণেরা জনসংখ্যার একটি প্রধান

অংশ ছিল। সেখানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। বলি দ্বীপে ব্রহ্মণ্য ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মও প্রচলিত ছিল। এখানে গণেশ, ব্রহ্মা ইত্যাদির মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র বলি দ্বীপেই হিন্দুধর্ম এখনও বাঁচিয়া আছে।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজগণের অধীনে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। মালয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি হিন্দু দ্বীপগুলি এই সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। আরব বণিকগণ শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। নবম শতাব্দীতে জাভা স্বাধীন হইয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ রাজেন্দ্র পরাক্রান্ত নৌবাহিনীর সাহায্যে শৈলেন্দ্র রাজগণকে পরাভূত করিয়া সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে এবং মালয় উপদ্বীপের মধ্য ও দক্ষিণ অংশে চোল কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে চোল কর্তৃত্বের অবসান হইলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্যর্থ সিংহল অভিযানের ফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন হয়।

বাংলাদেশের ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় শৈলেন্দ্র রাজগণ মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেন। রাজা বালপুত্রদেব পাল সম্রাট



বরবুদুর স্তূপ, জাভা

দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করেন। কুমারঘোষ নামক বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত শৈলেন্দ্র রাজগণের ধর্মোপদেষ্টা

ছিলেন। শৈলেন্দ্র রাজগণ শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাভার অপূর্ব বরবুদুর স্তূপ তাঁহাদের শিল্পানুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে আজও বিরাজমান। বরবুদুরের মন্দিরটির কয়েকটি স্তর ছিল এবং ইহার মোট আয়তন ছিল চার শত বর্গফুট। এই মন্দিরের স্তরে স্তরে এবং মন্দির গাত্রে অসংখ্য ভাস্কর্য ও বুদ্ধমূর্তি ভারত ও জাভার শিল্পকলার সমন্বয়ের এক অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজও বিবেচিত হয়। কোন কোন লেখকের মতে বরবুদুরের স্তূপ বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য।

মজপহিত সাম্রাজ্য—ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতনের পর আর একটি বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। জাভা দ্বীপের মজপহিত শহর ছিল ইহার রাজধানী এবং ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় ইসলাম শক্তির অগ্রগতিতে মজপহিত রাজ্যের পতন হয়।

জাভায় ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। অদ্যাপি সেখানে অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। রামায়ণ ও মহাভারত জাভাবাসীদের নিকট বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল; তাহাদের ধর্মজীবনে ও সাহিত্যে এই মহাকাব্য দুইটির অসামান্য প্রভাব দেখা যায়। জাভায় হিন্দু জাতিভেদ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও অসবর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল না এবং অস্পৃশ্যতার প্রচলন ছিল না।



ধনুর্ধারী রাম (জাভা)

চম্পা রাজ্য—ইন্দো-চীনের দুইটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্যের মধ্যে বর্তমান আনামের অন্তর্ভুক্ত চম্পা রাজ্য খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত চম্পার রাজারা যথেষ্ট পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চম্পায় ভারতীয়

সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজরীতি অনুসারে চম্পার সামাজিক ব্যবস্থায়ও ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ স্তরে। সংস্কৃত ছিল সরকারী ভাষা। দেবদেবীর মধ্যে শিবের প্রাধান্য ছিল। চম্পা রাজ্যে প্রাপ্ত সে যুগের সুদৃশ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজিও ভারতের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করিতেছে।

কম্বুজ দেশ—খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কৌণ্ডিন্য নামক এক ভারতীয় দক্ষিণ কাম্বোডিয়ার **ফু-নান** নামক হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ঐ রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভারত হইতে আগত সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ এই দেশে বাস করিতেন এবং দিবারাত্র শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফু-নানের পতনের পর শক্তিশালী কম্বুজ রাজ্য স্থাপিত হয়। কম্বুজের রাজধানী ছিল যশোধরপুর বর্তমান অঙ্কোরথোম। চরম উন্নতির যুগে **কম্বুজ সাম্রাজ্য** কাম্বোডিয়া ব্যতীত কোচীন, চীন, লাওস, শ্যাম, দক্ষিণ ব্রহ্ম ও মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। **পঞ্চদশ** শতাব্দীতে আনাম ও তাই জাতির আক্রমণে এই



কম্বুজে আঙ্কোরভাটের মন্দির

সাম্রাজ্যের অবসান হয়। সংস্কৃত ভাষা, জাতিভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি কম্বুজরাজ্যে প্রচলিত ছিল। যশোধরপুরের নিকটে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত **আঙ্কোরভাটের প্রসিদ্ধ মন্দির** হিন্দু শিল্পোৎকর্ষের এক অপূর্ব নিদর্শন। ২১৩ ফুট উচ্চ, ৳ মাইল দীর্ঘ এবং অর্ধ মাইল প্রশস্ত এই সুবৃহৎ মন্দিরটি পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়,

সন্দেহ নাই। বহু চূড়া ও গম্বুজযুক্ত এই মন্দিরটির স্তরে স্তরে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য আছে। বিখ্যাত রাজা সপ্তম জয়বর্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আঙ্কোরথোম নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, নগরটি অতি সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল। ইহা একটি প্রশস্ত পরিখা ও উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সুদৃশ্য মন্দির ও প্রাসাদ, চমৎকার তোরণ, প্রশস্ত রাজপথ ও পুষ্করিণী নগরীর শোভা বর্ধন করিত। নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল সুন্দর ও আকৃতিতে পিরামিডের সদৃশ বেয়ন মন্দিরটি। মন্দিরের গম্বুজগুলিতে অসংখ্য সুন্দর শিবমূর্তি খোদিত আছে। এক কথায়, যশোধরপুর সে যুগে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নগর ছিল।



বেয়ন মন্দিরের গাত্রের চিত্র

বৃহত্তর ভারত—ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বতের প্রাচীর ও দুই দিকে সমুদ্র রহিলেও ভারতীয় বসতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি এশিয়ায় বিস্তৃত হইয়া এক বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তুলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বত্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হইত এবং ভারতীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং ভারতীয় আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি এই দেশীয় লোকেরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে। হাজার হাজার দেবদেবীর মূর্তি, শত শত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পকলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

—

ত্রয়োদশ অধ্যায় | দিল্লীর সুলতানী শাসন (১২০৬-১৫২৬)

ভারতে তুর্ক-আফগান শক্তির অভ্যুদয়—একাদশ শতাব্দীতে আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর তুর্কী শাসক মামুদ (৯৯৮-১০৩০) সতের বার ভারত আক্রমণ করিয়া অনেক শহর ও মন্দির লুণ্ঠন করেন এবং বহু ধনরত্ন লাভ করেন। যদিও **সুলতান মামুদ** ভারতে স্থায়ী রাজ্য বিস্তারের

চেষ্টা করেন নাই, তথাপি তাঁহার অভিযানের ফলে পাঞ্জাবে তুর্কী আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং উত্তর ভারতীয় রাজ্যসমূহ দুর্বল হইয়া পড়িলে ভারতে মুসলমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে গজনীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘোর রাজ্যের পারসিক বংশোদ্ভূত মহম্মদ সিন্ধু ও গঙ্গার উপত্যকায় সুলতানী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। **মহম্মদ ঘোরী** (১১৭৩-১২০৬) মামুদের ন্যায় লুণ্ঠনকারী ছিলেন না, ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুদের পরাস্ত করিয়া **ভারত বিজয়ই** ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত তুর্কী ক্রীতদাস **কুতবউদ্দীন** দিল্লীতে প্রভুত্ব স্থাপন করেন (১২০৬-১০) এবং তিনিই ভারতের **প্রথম মুসলমান সুলতানরূপে** পরিচিত। কুতবউদ্দীন ও আরো দুইজন **ইলবারি** তুর্কী সুলতান জীবনের প্রারম্ভে ক্রীতদাস ছিলেন বলিয়া এই বংশকে বলা হয় **দাস** বংশ (১২০৬-৯০)। রাজ্যবিস্তারের পরিবর্তে রাজ্য সংরক্ষণই ছিল এই বংশের প্রকৃত লক্ষ্য। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যবাদের বলিষ্ঠ রূপকার ছিলেন তুর্কী জাতীয় **খলজী** বংশের (১২৯০-১৩২০) **আলাউদ্দীন** (১২৯৬-১৩১৬)। তিনি গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেন। উত্তর ভারতে তিনি একে একে গুজরাট, রন্থম্ভোর, চিতোর, মালব ইত্যাদি অঞ্চল জয় করেন। দাক্ষিণাত্যে



আলাউদ্দীন খলজী

তুর্কী সাম্রাজ্য বিস্তার আলাউদ্দীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার রাজ্যবিস্তারের মূলে ছিল একদিকে দুর্নিবার **ঐশ্বর্যের লোভ**, অপরদিকে **সাম্রাজ্যবাদী** উচ্চাকাঙ্ক্ষা। দাক্ষিণাত্য অভিযানের নায়ক সেনাপতি কাফুর দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র ও মাদুরা রাজ্যগুলি জয় করিলে মুসলমান শাসকগণের মধ্যে আলাউদ্দীনই সর্বপ্রথম ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন।

করৌনা তুর্কীবংশীয় তুঘলকদের রাজত্বকালে (১৩২০-১৪১৩) তুর্ক-

আফগান শক্তির পতনের সূচনা হয়। গিয়াসুদ্দীনের সময় বরঙ্গল ও বাংলার পূর্বাঞ্চল দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হয়। কিন্তু অনন্য গুণসম্পন্ন অথচ



বাস্তব বুদ্ধিবর্জিত মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে (১৩২৫-৫১) তুর্কী সাম্রাজ্য পতনের পথে অগ্রসর হয়। তিনি কাংড়া অঞ্চলের বিখ্যাত নগরকোট দুর্গ অধিকার এবং কুমায়ুন পর্বতমালার অন্তর্গত কারাচল অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করিলেও দক্ষিণ ভারতের মাবার রাজ্য, পূর্ববঙ্গ ও গুজরাট স্বাধীন হইয়া যায়। ফিরোজ তুঘলক বাংলা ও সিন্ধুদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে সুলতানী

শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যর্থ হন। অতঃপর চাগ্‌তাই তুর্কী নায়ক **তৈমুরের** ভয়াবহ আক্রমণে (১৩৯৮-৯৯) তুঘলক সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিনষ্ট হয়, যদিও সুলতান মামুদের ন্যায় তাঁহারও প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন। অচিরে সৈয়দ ও লোদী বংশ ক্রমান্বয়ে (১৪১৪-১৫২৬) দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে—লোদীরাই দিল্লীর প্রথম **আফগান** রাজবংশ। লোদীরা সুলতানী শাসনের হৃত গৌরব কিছুটা উদ্ধার করে। কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) সুলতান ইব্রাহিম লোদী কাবুলের অধিপতি বাবরের নিকট পরাজিত ও নিহত হইলে আফগান প্রভুত্বের ও তিন শতাব্দীকাল স্থায়ী সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।



মহম্মদ বিন তুঘলক

রাজনৈতিক জীবন—সুলতানী যুগের **রাষ্ট্রনীতি ইসলাম ধর্মের** অনুশাসনের **ভিত্তিতে পরিচালিত** হইত। তাই এই রাষ্ট্রে মুসলমান পুরোহিত শ্রেণী বা উলেমা স্বভাবতই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পৌত্তলিকতা ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা দমন এবং বিধর্মীদের ধর্মান্তর-করণ মুসলমান রাষ্ট্রের দায়িত্বরূপে চিহ্নিত হয়। সুলতানী রাষ্ট্রে অমুসলমান প্রজাদিগকে 'জিম্মী' বা আশ্রিত বলা হইত, অর্থাৎ কতকগুলি সর্তে অমুসলমান জনগণ মুসলমান রাষ্ট্রে বাস করিবার অধিকারী ছিল। এই সর্তগুলির অন্যতম ছিল জিজিয়া কর দান। এইভাবে অধিকাংশ তুর্ক-আফগান শাসক সঙ্কীর্ণ হিন্দু-বিদ্বেষী নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দুদের নানারূপে নিপীড়ন-নির্যাতন করিতেন। করভারে প্রপীড়িত ও উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইয়া হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ ও রিক্ত-হস্ত হয় এবং আপন রাজনৈতিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

শাসনব্যবস্থা—তুর্কীরা শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো পরিবর্তন করে নাই। সুলতান সরকারের সামরিক ও অসামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন

এবং 'ওয়াজির' (মুখ্যমন্ত্রী) প্রমুখ মন্ত্রীদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ভূমি-রাজস্ব ('খারাজ') ছিল রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস, ইহার পরিমাণ ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ বা অর্ধাংশ। ইসলামের পবিত্র আইন অনুযায়ী সুলতান খারাজ ও জিজিয়া ব্যতীত জনগণের উপর 'খাংসা' (যুদ্ধে হৃত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ) ও 'জাকত্' (ধর্মীয় কর) করসমূহ আরোপ করিতেন।

বিচার বিভাগ ছিল সুলতানী শাসনব্যবস্থার দুর্বলতম বিভাগ। কাজীরা (বিচারক) পবিত্র কোরান অনুযায়ী মুসলমানদের বিচার করিতেন, অমুসলমানদের বিচার হইত তাহাদের নিজস্ব আইন অনুসারে। বিচার ছিল সংক্ষিপ্ত, শাস্তি কঠোর এবং সর্বত্র একই বিচার পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। সুলতানেরা রাজকোষ হইতে ক্ষুদ্র স্থায়ী সেনাদল পোষণ করিতেন; **সেনাবাহিনীর** প্রধান অবলম্বন ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও ইক্তাদারের প্রেরিত সৈন্যেরা। এই বাহিনী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং হস্তীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। বিভিন্ন জাতির সংগ্রহে গঠিত সুলতানী বাহিনীতে ঐক্যের অভাব ছিল।

নিয়মিত করদান ও যুদ্ধে সুলতানকে সাহায্যদানের বিনিময়ে বিজিত রাজপুত রাষ্ট্রগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সুলতানী রাজ্যে বজায় ছিল। রাজ্যের বাকী অংশ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। **প্রদেশে** 'মুক্তি'রা রাজার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন, প্রদেশগুলি আবার **পরগণা** ও **গ্রামে** বিভক্ত ছিল। তুর্কী শাসন সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি টিকিয়া যায়।

সামাজিক জীবন—সুলতানী যুগের সামাজিক অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। একদিকে দেশের ধনী **সম্প্রদায়**, বিশেষতঃ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলমান আমীর-ওমরাহ, জায়গীরদার ও উলেমা শ্রেণীর লোক সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী ছিল এবং বিলাস-ব্যসনে জীবন নির্বাহ করিত। অন্যদিকে **সাধারণ** মানুষের জীবনযাত্রার মান ছিল খুবই নিম্ন। সাধারণ লোক, বিশেষতঃ কৃষকগণ, করভারে জর্জরিত ছিল। সুলতানী শাসন ব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী ও ধর্মভিত্তিক। তাই সমাজে উলেমা ও

* [illegible]

অভিজাত শ্রেণী সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত। মুসলমান অভিজাত শ্রেণী বেতনের পরিবর্তে ইক্‌তা বা ভূমির উপর অধিকার লাভ করিত। তাই আমীর-ওমরাহগণের হস্তে প্রচুর অর্থ আসিয়াছিল। রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু **হিন্দু** জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক **নির্যাতনের** ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিজাতীয় ও বিধর্মী শাসকদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু সমাজে ক্রমে নানা সামাজিক সঙ্কীর্ণতার উদ্ভব হয়। এই সময়ে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা কঠোর হইয়াছিল এবং হিন্দু নারীকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাপকভাবে বাল্যবিবাহ ও পর্দা প্রথার প্রচলন হয়। তবে সাধারণভাবে, এই যুগে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই **নারীর স্থান গৌরবজনক ছিল না**; সকল শ্রেণীর লোকেই কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিকতর কাম্য মনে করিত। আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক স্বাধীনতা থাকিলেও নারীরা সাধারণতঃ পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। সুলতানী আমলের সামাজিক অবস্থার আর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক ছিল **ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন**। ক্রীতদাস-পোষণের মধ্য দিয়া মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি হইত। তবে বহু ক্রীতদাস আপন নৈপুণ্য দ্বারা রাষ্ট্রের উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিল, এমনকি সুলতানের পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক জীবন—প্রাচীনকালের ন্যায় সুলতানী যুগে কৃষিই ছিল ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। তথাপি এই যুগে শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত হয়। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন **শিল্প** প্রসার লাভ করে। ইহাদের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, চর্মশিল্প ও কাগজ নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য। রাজসভার প্রয়োজনের তাগিদে সরকারের নিজস্ব কারখানা ছিল। বিভিন্ন বণিক-সঙ্ঘ ও শিল্প-সঙ্ঘগুলি দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিত। অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতের গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সুলতানী আমলে ভারতের অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক **বাণিজ্যও** যথেষ্ট উন্নত ছিল। জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, পূর্ব আফ্রিকা ও ইউরোপের সহিত বাণিজ্য চলিত, এবং স্থলপথে মধ্য-

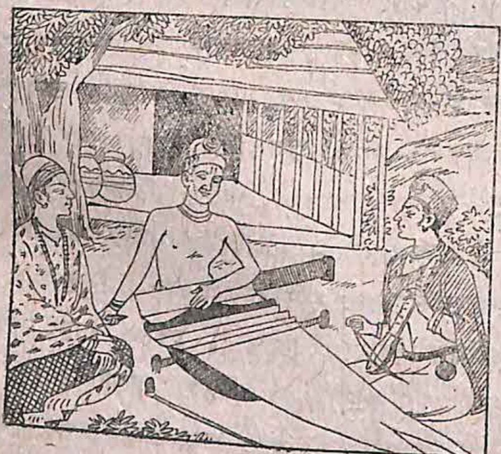
এশিয়ার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারত একদিকে অশ্ব ও নানাবিধ বিলাস-সামগ্রী আমদানী করিত, অন্যদিকে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিত। বাংলাদেশ ও গুজরাটের বন্দরগুলি হইতেই ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের আদান-প্রদান হইত।

ইসলাম ও হিন্দুধর্ম ঃ সংঘর্ষের পর সমন্বয়—প্রাচীনকাল হইতে বহু বৈদেশিক জাতি বাহুবলে ভারতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছে। অথচ কিছু-কালের মধ্যেই তাহারা ভারতীয় সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীগণ হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হয় নাই। তাহারা আপন ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের সহিত ইসলামের মূলগত পার্থক্য ছিল। ইসলাম হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও সামাজিক সংগঠন অস্বীকার করিল। হিন্দু সমাজেও অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণকারীগণ ব্যাপক লুণ্ঠন ও রক্তপাতে লিপ্ত হওয়ায় তাহাদের সহিত আক্রান্ত ভারত-বাসীর সম্পর্কে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়। সুলতানী যুগের প্রথম দিকে মুসলমান প্রজারা যে-সকল সুখ-সুবিধা ও অধিকার পাইত, হিন্দুদের তাহা হইতে বঞ্চিত করা হইত। তুর্ক-আফগান শাসকদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা স্বভাবতই হিন্দুদের মনে বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু একই দেশের অধিবাসীর মধ্যে এইরূপ বিরোধ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কালক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিল। ফলে একদিকে হিন্দুদের মনে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অপরদিকে মুসলমানদের মনে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে একেশ্বরবাদী ও গণতান্ত্রিক ইসলাম-ধর্মের প্রভাবে হিন্দু ধর্মে ভক্তি আন্দোলন নামক এক উদার ধর্মনৈতিক আন্দোলনে গতি সঞ্চার হয়। ভক্তিবাদ সুলতানী যুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে বিশেষ সহায়তা করে।

ভক্তি আন্দোলন—ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা হইল যে প্রেম ও ঐকান্তিক ভক্তিই প্রকৃত ধর্মলাভের একমাত্র উপায়। ভক্তির অর্থ হইল কামনা-বাসনা রহিত হইয়া ঈশ্বরচিন্তা। আচারবহুল আনুষ্ঠানিক ধর্ম

মানুষকে যথার্থ মুক্তি দিতে পারে না, ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট মানুষকে ভালবাসিয়া মুক্তি লাভ করিতে হইবে। প্রেমের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ভক্তি আন্দোলন অন্য ধর্মের প্রতি **সহনশীলতার** নির্দেশ দিয়াছিল। এই সরল বাণী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, ধর্মের ক্ষেত্রে বিজেতা মুসলমান ও বিজিত হিন্দুর মিলনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। **চতুর্দশ শতাব্দীর** শেষদিকে ভক্তি-আন্দোলনের সূচনা করেন কনৌজী ব্রাহ্মণবংশীয় **রামানন্দ**।

কবীর—রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন **কবীর**। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা **পঞ্চদশ শতাব্দীর** প্রথমভাগে কবীর বর্তমান ছিলেন। বারাণসীতে বস্ত্রবয়ন তাঁহার বৃত্তি ছিল। গুরু রামানন্দের নিকট হইতে প্রেম ও ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ করার পর তিনি ধর্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শাস্ত্রের বিধান অথবা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে তিনি কোনই গুরুত্ব দিতেন না। যে ধর্মে ভক্তির স্থান নাই তাহা কখনই প্রকৃত ধর্ম হইতে পারে না—ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।



বারাণসীতে বস্ত্রবয়নরত কবীর

তিনি একমনে ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকিবার উপদেশ দেন। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে বাহ্যিক আচার-আচরণের ভেদ রহিলেও তিনি উহাদের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, রামই বল, রহিমই বল—হরিই বল আর আল্লাই বল,—মানুষের মনের প্রার্থনা একজনেরই নিকট পৌঁছাইবে। তাঁহার মতে, সকল মানুষ এক ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তাঁহার চক্ষে সকলেই সমান। এইরূপে **'সকলেই মানুষ জাতি,'**

'সকল ধর্মই এক এবং অভিন্ন' এই মত প্রচার করিয়া কবীর হিন্দু ও মুসলমানকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। দুই সম্প্রদায় হইতেই তিনি শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ 'কবীরপন্থী' নামে পরিচিত। সাধারণের বোধগম্য সরল হিন্দী ভাষায় অসংখ্য 'দোঁহা' বা কবিতা রচনা করিয়া কবীর তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। সমাজ-সংস্কারের উপরও কবীর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। সমকালীন সমাজে জাতিভেদ প্রথা ও নারীজাতির নিম্নদশায় তাঁহার আপত্তি ছিল। শিষ্যদের সমাবেশে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে তিনি স্ত্রীলোকদের যোগ দিতে উৎসাহ যোগাইতেন।

শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩)—মধ্যযুগের সন্ন্যাসব্রতী ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রবর্তক **শ্রীচৈতন্য**। বাংলাদেশের নবদ্বীপে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। বৈষ্ণব-গুরু ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি কৃষ্ণনাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রচার করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম জীবনের লীলাভূমি বৃন্দাবনকে ভূ-স্বর্গের মর্যাদা দেন। ঈশ্বরের প্রতি **ভক্তি** এবং ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও **বিশুদ্ধ প্রেম**—ইহাই ছিল তাঁহার মূল বাণী। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে তিনি তাঁহার উদার ধর্মমত প্রচার করেন। যবন হরিদাস নামক জনৈক মুসলমান শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। কীর্তন নামক সমবেত ভক্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি-ঈশ্বরআরাধনায় এক নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশ ব্যতীত উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পর্যটন করিয়া তিনি প্রেমধর্ম প্রচার করেন। দীর্ঘকাল পুরীতে বাস করিয়া সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার



শ্রীচৈতন্য

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না বলিয়া সমাজের সংখ্যাগুরু তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের মনে সঞ্চারিত হইল এক গভীর আত্মপ্রত্যয়। তাঁহার শিষ্যেরা বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

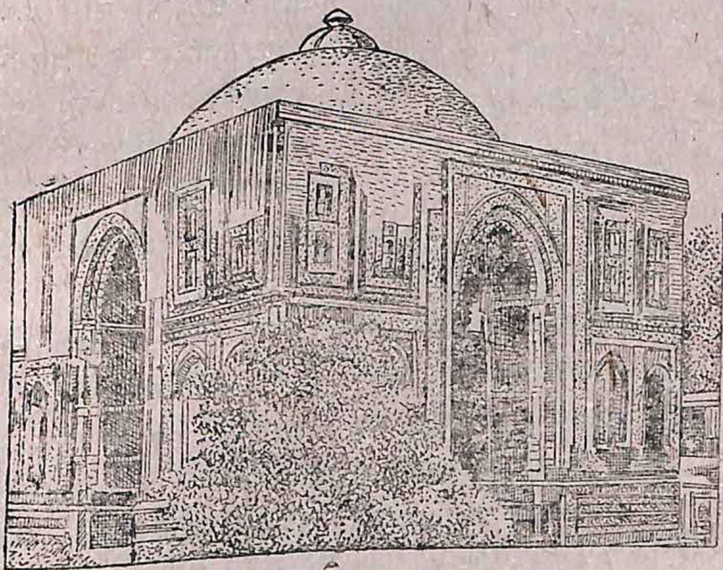
নানক (১৪৬৯-১৫৩৮)—**শিখ** ধর্মের প্রবর্তক **নানক** মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবে লাহোরের অন্তর্গত তালবন্দী গ্রামে এক ক্ষত্রী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি ফকিরের বেশে ভারতের নানা-স্থানে এবং আফগানিস্থান, পারস্য ও মক্কায় পরিভ্রমণ করেন। ক্রমে সাধনাবলে তিনি পরম সত্যের সন্ধান পাইলেন। শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মজীবনের সহায়ক নহে—ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন; সৎ ভাবে গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিলে এবং ঈশ্বরে অবিচলিত **প্রেম ও ভক্তি** থাকিলে মানুষ মুক্তি পাইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—ইহাই ছিল তাঁহার ধর্মের মূলতত্ত্ব। **হিন্দুধর্মের সহিত ইসলামের সমন্বয়** সাধন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। নানক উপাসনার ব্যাপারে **জাতিভেদ** মানিতেন না। অনেক মুসলমানকেও তিনি শিষ্য করেন। মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নাই ইহা তিনি বেশ দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন। জাতিনির্বিশেষে তাঁহার শিষ্য মাত্রেই এক রন্ধনশালায় আহার করিবে—ইহাই ছিল নানকের অনুশাসন। সমাজে **নারীর স্থান** উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার শিষ্য সমাবেশে স্ত্রীলোকদের যোগ দিতে উৎসাহিত করিতেন। পদ্যের আকারে প্রাচীন হিন্দীতে লিখিত নানকের উপদেশগুলি **'আদিগ্রন্থে'** লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।


গুরু নানক

ভক্তি আন্দোলনের ফল—চতুর্দশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করিয়া যে উদারনৈতিক সংস্কারমূলক আন্দোলন উত্তর প্রদেশ, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে দেখা দেয়, তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মগুরুগণ

সহজবোধ্য আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে ধর্ম প্রচার করায় বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাংলা ও মারাঠী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তৃতীয়তঃ, ধর্মপ্রচারকগণ প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃতে লিখিত বহু তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনা করায় জনচিত্তে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগিল।

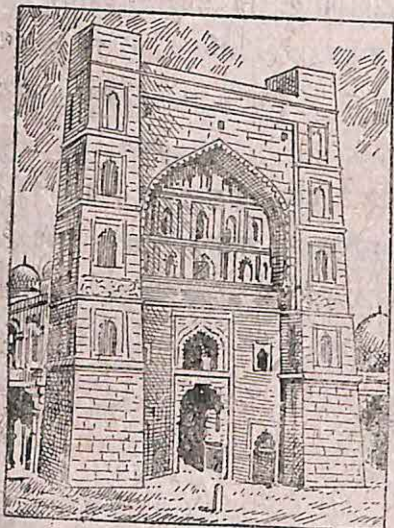
শিল্প ও সংস্কৃতি—হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি পাশাপাশি বসবাস করার ফলে উভয়ের মধ্যে যে **সমন্বয়** সাধিত হয় তাহার প্রভাব শিল্পেও পরিলক্ষিত হইল। তুর্কীরা নূতন ধরনের স্থাপত্য (মসজিদ ও সমাধি) এবং নূতন



আলাই দরওয়াজা

নির্মাণ পদ্ধতি (খিলান ও বৃহৎ গম্বুজ) ভারতে প্রবর্তন করে। কিন্তু তাহারা হিন্দু শিল্পী নিযুক্ত করায় হিন্দু ও মুসলমান বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে এক নূতন **স্থাপত্য** রীতি গড়িয়া উঠে। ফলে মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধিভবনে **ভারতীয়** কারুকার্য ও শিল্প-ভঙ্গীর সহিত প্রকাশ পাইল পারসিক ও মধ্য এশীয় আকার। স্থলতানী যুগে দিল্লী ও প্রাদেশিক এই দুই

ধরনের স্থাপত্য উদ্ভূত হয়। দিল্লীর স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে কুতুব-মিনার, আলাই-দরওয়াজা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাদেশিক রীতি-গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রধানতঃ বাংলা, গুজরাট ও কাশ্মীরে। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, জৌন-পুরের অটলাদেবীর মসজিদ, আমেদাবাদের জামি মসজিদ প্রভৃতি প্রাদেশিক স্থাপত্যরীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। প্রাদেশিক স্থাপত্যরীতিতে হিন্দু প্রভাব অধিকতর লক্ষ্য করা যায়। সুলতানী আমলে বিজয়নগর, মেবার ও উড়িষ্যায় হিন্দু স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়।



অটলা মসজিদ

পারসিক রীতির প্রভাবে জৈন চিত্রশিল্পে কিছু পরিবর্তন হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, জৈন চিত্রশিল্পীরা ছবির পটভূমি সম্পর্কে বেশী মনোযোগী হয় এবং কোমলতর রঙের ব্যবহার শুরু করে। পারসিক পোষাক ও হিন্দু বিষয়-বস্তুর সমন্বয়ে কথক নামে এক নূতন ধারার নৃত্যের উদ্ভব হয়। উর্দু ভাষায় 'গজল' নামে এক নূতন ধরনের পারসিক কবিতার প্রচলন হয়। ভারতীয় ও পারসিক সঙ্গীতের সম্মিলনে আধুনিক কালের উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উদ্ভূত হয়। মুসলমানেরা নূতন সুর ও বাদ্যযন্ত্র প্রবর্তন করে। বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু পারসিক তান্‌পুরা ও দক্ষিণ ভারতীয় বীণার মিলনে সেতার এবং দক্ষিণ ভারতীয় ঢাক বদলাইয়া তবলা সৃষ্টি করেন। ভারত মুসলমানদের নিকট হইতে ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পিষ্ট কাগজের মণ্ড হইতে কঠিন পদার্থ তৈয়ারের ও এনামেল দিয়া কলাই করার কৌশল আহরণ করে।

ভাষা ও সাহিত্য—হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবের

প্রতিফলন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ভক্তি আন্দোলনের মহাপুরুষেরা তামিল, কানাড়া, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী ও বাংলায় অত্যন্ত মৌলিক ও বলিষ্ঠ সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করায় **প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি** হইল। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থের আঞ্চলিক ভাষায় **অনুবাদের** ফলে এই উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। তুলসীদাস হিন্দীতে রামায়ণ এবং জ্ঞানেশ্বর মারাঠীতে গীতা অনুবাদ করেন। অকৃত্রিম অনুরাগ ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের তাগিদে বাংলার তুর্কী শাসকেরা বাংলা ভাষার অগ্রগতিতে উৎসাহ দেন। সুলতানী আমলেই অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়।

মুসলমান সুলতানেরা আঞ্চলিক ভাষারও বিকাশ সাধনে সহায়তা করেন। হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার জ্বলন্ত উদাহরণ হইল পারসিক ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে **উর্দু** ভাষার জন্ম, যে ভাষা সুলতানী রাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থানে সাধারণ মানুষ বুঝিত। আরবী বর্ণমালায় লিখিত হইলেও হিন্দী ব্যাকরণের ভিত্তিতে উর্দু প্রতিষ্ঠিত এবং এই ভাষার শব্দসম্ভার পারসিক, তুর্কী, আরবী ও হিন্দী হইতে গৃহীত। তুর্কীদের আগমনের ফলে উত্তর ভারতের বহু জায়গায় সংস্কৃতের পরিবর্তে পারসিক রাষ্ট্রভাষা হওয়ায় **সংস্কৃতের** গুরুত্ব হ্রাস পাইলেও ইহা উচ্চশিক্ষার ভাষারূপে অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সময়ে ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ, জিয়াউদ্দীন বরনি প্রভৃতির রচনায় **পারসিক** সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। তবে আমীর খসরু ছিলেন নিঃসন্দেহে সুলতানী ভারতে শ্রেষ্ঠ পারসিক পণ্ডিত। তিনি হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন এবং পারসিক কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে লেখেন।

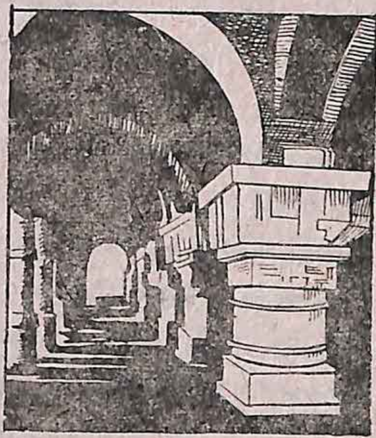
ইলিয়াস শাহী ও হুসেনশাহী আমলে বাংলাদেশ—মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৪৫)। তাঁহার ও সিকন্দর শাহের রাজত্বে দিল্লীর অধীশ্বর ফিরোজ তুঘলক বাংলা পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হন। পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন কবি ছিলেন এবং বিখ্যাত কবি হাফিজের সহিত তাঁহার পত্রালাপ চলিত। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে, প্রায় ত্রিশ বৎসর পর, ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

বজায় ছিল। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নামে এক আরব বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। হুসেন শাহী রাজত্ব (১৪৯৩-১৫৩৮) মধ্যযুগীয় বাংলার গৌরবময় যুগ। হুসেন শাহ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি এবং পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করিয়া বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ সুযোগ্য শাসক এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অবশেষে নসরতের ভ্রাতা গিয়াসুদ্দিনকে পরাজিত করিয়া শেরশাহ বাংলাদেশ দখল করেন।

সমাজ ঃ হিন্দু ও মুসলমান বহুদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় শত্রুতার ভাব কাটিয়া গেল এবং মিত্রতার ভাব জাগিল। বাঙ্গালী হিন্দুরা আজকাল সত্যনারায়ণের 'শিরণী' দিয়া থাকেন। হুসেন শাহের আমলেই ইহার প্রবর্তন হয়। তখন ইহার নাম ছিল 'সত্যপীরের শিরণী'। ইসলামের সংস্পর্শে একদিকে হিন্দুসমাজে নানা কঠোর বিধিনিষেধ ও আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয় (রঘুনন্দনের 'স্মৃতিশাস্ত্র' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য), অন্যদিকে চৈতন্যের মতবাদ হিন্দু-ধর্মকে উদার করিল।

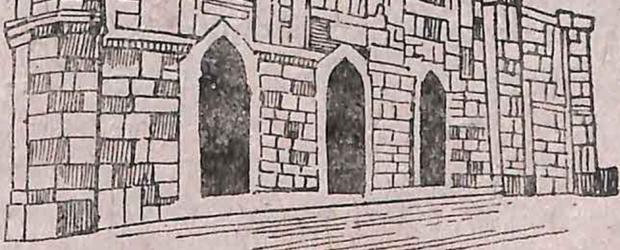
সংস্কৃতি ঃ বৈষ্ণব আচার্যদের চেষ্টায় এবং সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় **বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের** বিশেষ উন্নতি হয়। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত পদ বা গীতিকবিতায় রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বলা হইয়াছে। বিদ্যাপতি ঠাকুর নামে আরেকজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় কবিও ইলিয়াস শাহী আমলে সাহিত্য সাধনা করেন। ঐ বংশেরই সুলতান বারবক শাহ বাংলাভাষায় রামায়ণের অনুবাদক মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বারবক শাহ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের খ্যাতিমান রচয়িতা মালাধর বসুরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে, অনেক স্থানে ভাগবতের অংশবিশেষের অনুবাদ আছে। মালাধর 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়া একখানি সুখপাঠ্য বাংলা মহাভারত রচনা করান। নসরৎ

শাহের সময়ে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' বাংলায় অনুবাদ করেন। হুসেন শাহী আমলের অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ হইল কবি বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই-র লিখিত 'মনসামঙ্গল' এবং শ্রীধর কবিরাজের 'কালিকামঙ্গল' কাব্য। বাংলা ভাষার অনুশীলন ব্যতীত সুলতানী রাজত্বের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বহু জায়গায় টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। এখানে কাব্য, অলংকার, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি পড়ানো হইত।



আদিনা মসজিদ

বাংলার স্থলতানরা শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে হিন্দু-মুসলমান ধারার সংমিশ্রণে নূতন স্থাপত্য রীতির উদ্ভব হয়। সিকন্দর শাহের রাজত্বে পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়।



বড় সোনা মসজিদ

ইহার স্থাপত্য কৌশল অতুলনীয়। ভারতীয় মসজিদগুলির মধ্যে ইহা

আয়তনে দ্বিতীয়। বারবক শাহ গৌড়ে 'দাখিল দরওয়াজা' নামে বিরাট ও সুন্দর তোরণটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। হুসেন শাহের সময় গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতি ফটক নির্মিত হয়। ইহাদের শিল্পসৌন্দর্য অসাধারণ। নসরৎ শাহের রাজত্বকালে গৌড়ে বড় সোনা মসজিদ নির্মিত হয় এবং ইলিয়াস শাহী আমলের বিখ্যাত 'কদম রসুল' ভবনের সংস্কার হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলাদেশ ধন-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দেশের শস্য-সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইলিয়াস শাহী রাজত্বের সূচনায় ইবন্ বতুতা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের মত কোথাও জিনিষপত্রের দাম এত সস্তা নহে এবং এখানে প্রচুর ধান ফলিত। পঞ্চদশ শতকে বাংলায় আগত চীনা রাজদূতগণের বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশী পর্যটক মৌহান (১৪০৬) বাংলার বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হুসেন শাহ গৌড়ের লুণ্ঠনকারীদের বধ করিয়া বহু ধনরত্ন পাইয়াছিলেন। ইতালীয় পর্যটক বার্থেমা (১৫০৫) বাংলাদেশের ধনী বণিক এবং ইহার বিস্তৃত বাণিজ্যসম্ভারের—বিশেষতঃ সূতা ও রেশমের কাপড়, আদা, চিনি, শস্য ও মাংসের—উল্লেখ করিয়াছেন। পোর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিবরণের (১৫১৪) সারমর্ম এই—এদেশের বড় বড় বণিকেরা নানা দ্রব্যে জাহাজ বোঝাই করিয়া করমণ্ডল ও মালবার উপকূল, ব্রহ্মদেশ, লঙ্কা ও আধুনিক ইন্দোনেশিয়ায় যাইত; এখানে বহু পরিমাণ তুলা, ইক্ষু, উৎকৃষ্ট আদা, মরিচ ও ফল উৎপন্ন এবং নানা রকমের সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ারী হইত। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে সেনশাহ রাজত্ব পর্যন্ত বাংলার সমৃদ্ধি অটুট ছিল।

পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ৪০০ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যযুগের প্রথম পর্ব। শার্লমেনের সাম্রাজ্য ও ক্যারোলিঞ্জীয় রেনেসাঁস এই পর্বের চরম শিখর। ৮০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল মধ্যযুগের মধ্যভাগ। ইহাকে বলা হয় সামন্তযুগ। এই অধ্যায়েই মধ্যযুগীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। সামন্তপ্রথার বিকাশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর নবজাগরণে তাহারই অভিব্যক্তি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী (১৩০০—১৫০০ খ্রীঃ) মধ্যযুগের শেষ অধ্যায়। ইটালীর রেনেসাঁস এই অধ্যায়ের স্বর্ণশিখর। এই পর্বে যে সব ঘটনা ও পরিবর্তনের স্রোত আসে তাহার ফলে মধ্যযুগের অবসান হইয়া আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এক সময়ে বল্কান উপদ্বীপ হইতে সিরিয়া, মিশর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ছিল তাহা ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইতে হইতে এই সময়ে কন্‌স্টান্টিনোপল ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীদের আক্রমণে কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন হয়। কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে প্রভাবিত করে। পশ্চিমে কিছু পূর্বেই এই রেনেসাঁসের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। ক্লাসিক (গ্রীক-রোমান) সাহিত্যচর্চার প্রতি নূতন আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। ইটালীতে এই আগ্রহ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। ইটালীতে রোমান ঐতিহ্য কোনদিনই বিনষ্ট হয় নাই কারণ ইটালী ছিল ঐ ঐতিহ্যের উৎসস্থল। উপরন্তু বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অংশরূপে ইটালী ক্লাসিক ঐতিহ্যের গ্রীক অংশকেও রক্ষা করে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ছিল গ্রীক সংস্কৃতির ধারক। কন্‌স্টান্টিনোপলে গ্রীক সাহিত্যের দুর্লভ পাণ্ডুলিপিগুলি সুরক্ষিত ছিল। তুর্কীদের হাতে কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন হইলে গ্রীক পণ্ডিতগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপি লইয়া পশ্চিমে পলাইয়া আসেন। ইহার ফলে ইউরোপে গ্রীক সাহিত্যচর্চার প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং রেনেসাঁস সমগ্র ইউরোপে বিস্তারলাভ করে।

মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মানুষের চিন্তাধারাকে চার্চ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিত। ফলে ইউরোপবাসী প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ভুলিয়া যাইতে থাকে। গ্রীক ও রোমানরা ছিল প্রকৃতির উপাসক। তাহাদের রচিত পুস্তক পাঠ ও প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করা চার্চ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মনে জড়তা আসে ও স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে মানুষের চেতনা এই জড়ত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। এই নবচেতনার উন্মেষ ও **স্বাধীন চিন্তাধারার পুনর্জন্মকেই** রেনেসাঁস বলা হইয়া থাকে। চিন্তার স্বাধীনতাই ছিল গ্রীক ও রোমান জাতির বৈশিষ্ট্য। ইটালীর স্বাধীন শহরগুলিতেই এই নবজাগরণের সূচনা হয়। প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে নব-চেতনার উন্মেষ হয়। ইটালীর **পেত্রার্ক, বোকাসিও, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, মিকায়েল অ্যাঞ্জেলো** প্রভৃতি মনীষীগণ ছিলেন এই নব-জাগরণের অগ্রদূত। ইংলণ্ডে **টমাস মুর ও ফ্রান্সিস বেকনের** নাম উল্লেখ্য।

আধুনিক রেনেসাঁস ইউরোপবাসীগণের সম্মুখে এক নূতন জীবনাদর্শ স্থাপন করে। অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এক নূতন অনুসন্ধিৎসু মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইল। কোন কিছুকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করিয়া যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা। এই সময় **হিউম্যানিসম**-এর উৎপত্তি হয়। পারলৌকিক বিষয়ের পরিবর্তে পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনুরাগ এই মতবাদের প্রাণবস্তু। তখনকার সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যে ইহা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীকে ও প্রকৃতিকে জানিবার এই যে ইচ্ছা তাহার ফলে মানুষের জ্ঞানের সীমানা বর্ধিত হয় এবং **আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়।** পিটার অ্যাবেলার্ড ও রোজার বেকন প্রমুখ মনীষীগণ ধর্মের অনুশাসন অপেক্ষা যুক্তির উপর জোর দিয়া পূর্বেই মানসিক অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। বেকন বারুদ ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতিতে লিওনার্দো দ্য-ভিঞ্চি, **ওরেস্‌মের নিকোলাস, মুন্সার, আলবার্ট, বুরিদাঁ, কুসার নিকোলাস, কোপার্নিকাস, ব্রাহে, কেপলার, গ্যালিলিও** প্রভৃতির

নাম স্মরণীয়। জ্যামিতিতে ওরেস্‌মের নিকোলাসের ও গণিতে মূলারের অবদান অসামান্য। কোপার্নিকাস প্রথম প্রমাণ করেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। এই সময় মুদ্রাযন্ত্রও আবিষ্কৃত হয় এবং বহু পুস্তক রচিত হওয়ায় শিক্ষা ও বুদ্ধির জগতে বিপ্লব আসে।

এই সময় নাবিকের কম্পাস, সমুদ্রের মানচিত্র প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সকল আবিষ্কারের ফলে এবং তদুপরি অজানাকে জানিবার স্পৃহা ও অনুসন্ধানী মনোবৃত্তির উন্মেষ হওয়ায় সমুদ্রপথে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ধুম পড়িয়া যায়। একদল দুঃসাহসিক নাবিক ও বণিক এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়। স্পেন ও পোর্তুগাল এই সামুদ্রিক অভিযানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। পোর্তুগীজ নাবিক বার্থলোম্যু দায়াজ আফ্রিকার দক্ষিণ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন। কলম্বাস আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কাব্রাল ব্রেজিল ও ম্যাগেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের দক্ষিণ উপকূলে আসিয়া পৌঁছান। এই ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ইহার ফলে ইউরোপের প্রসার হয়। ইউরোপীয় শক্তিগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। সমগ্র পৃথিবী ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। ইউরোপীয় শক্তিগুলি ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারলাভ করে এবং সেখানে মূলধনী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন।

মধ্যযুগের শেষে মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে ও নূতন জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান হয়। সামন্ততন্ত্রের অবনতি ঘটে ও গ্রামীণ ম্যানোরীয় অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়ে। আন্তঃশহর বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং ঘরোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে বর্তমান শিল্প সংগঠনের সূচনা হয়। কুটীর শিল্পের বিকাশ হয়। বস্ত্রবয়ন শিল্পের জন্য পশমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মেষ-পালন শুরু হয় এবং ইংলণ্ড ও ফ্লানডার্সে এক গ্রামীণ বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠে।

সমাজে প্রভাব বজায় রাখিলেও অভিজাত শ্রেণী শাসনক্ষমতা হারায়। কামান ও বারুদের আবিষ্কারে তাঁহাদের সামরিক শক্তি হ্রাস পায়। ইহাতে রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই নূতন সবল রাজশক্তির নেতৃত্বে নূতন জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের উদয় হয়। ইহাদের মধ্যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, পোর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ্য। ফ্রান্সের কেপেশিয়ান ও ইংলণ্ডের টিউডর রাজবংশ ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কেপেশিয়ান ও ভেলয় রাজগণ ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া জাতীয় রাজতন্ত্রের মহিমান্বিত সৌধ নির্মাণ করেন। ইংলণ্ডে অভিজাততন্ত্রের অবক্ষয় হইয়া নূতন রাজশক্তির জয় সূচিত হয় এবং টিউডর রাজগণের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি দেখা দেয়। এই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাঁহারা অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজশক্তিকে সমর্থন করে। জাতীয় পার্লামেণ্টে এতদিন অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। এখন হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইহাতে যোগদান করিয়া জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। ইংলণ্ডের টিউডর রাজারা পার্লামেণ্টের সহায়তায় অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ওলন্দাজেরা স্পেনের বিরুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করে ও এইভাবে হল্যাণ্ড স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এইরূপে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নূতন ভাবধারার সংঘাত দেখা দেয়। ম্যানোরীয় প্রথার সহিত নূতন অর্থনীতির, অভিজাততন্ত্রের সহিত রাজশক্তির, বিশ্বাসের সহিত যুক্তির ও ধর্মীয় অনুশাসনের সহিত বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বে শেষোক্ত শক্তিগুলি জয়লাভ করে। ইহার ফলে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে ও আধুনিক যুগের অভ্যুদয় হয়। মধ্যযুগকে বলা হয় **'বিশ্বাসের যুগ'** (Age of Faith), ইহার প্রতিভূ ছিল পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য, রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও আকাশ ছোঁয়া গথিক গীর্জা। আধুনিক যুগ যুক্তির যুগ, বিজ্ঞানের যুগ ও বিপ্লবের যুগ।

———

॥ আদর্শ প্রশ্ন ॥

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

১। ইউরোপে কখন ও কিভাবে মধ্যযুগ শুরু হয় ?

২। মধ্যযুগ বলিতে কোন্ সময়কালকে বুঝায় ? ইহার ক্রমবিকাশ কি সর্বত্র সমান ?

৩। মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :—১। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে এবং কেন পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতন হয় ? ২। পশ্চিমে মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখ কর। ৩। মধ্যযুগে সমাজে কোন শ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে ? ৪। ভারতে মধ্যযুগে কোন্ জাতির উত্থান হয় ? টিউটন জাতি কাহাদের বলে ?

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

১। হূন কাহারা ? হূন, গথ ও ভ্যাণ্ডালদের রোম আক্রমণের বিবরণ দাও।

২। জার্মানদের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল ?

৩। জার্মান উপজাতিগুলি রোম-সাম্রাজ্যের কোথায় বসতি স্থাপন করে? তাহাদের রোম জয়ের ফলাফল কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :—১। কি কারণে অ্যাটিলা রোম আক্রমণ করেন নাই ? ২। জার্মান উপজাতিগুলি কিভাবে বাস করিত ? ৩। জার্মান উপজাতিগুলি কেন রোমান-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :—১। হূনদের জন্মভূমি কোথায় ? কেন তাহারা ইউরোপ অভিযান করে ? ২। হূনগণের প্রধান খাদ্য ও অস্ত্র কি ছিল ? ৩। এলারিক কে ? কোন্ সালে তিনি রোম লুণ্ঠন করেন ? ৪। কাহার অনুরোধে ভ্যাণ্ডালগণ রোমের গীর্জাগুলিকে ধ্বংস করে নাই ? ৫। কোন্ ব্যক্তিকে 'ভগবানের অভিশাপ' বলা হয় এবং কেন ? ৬। জার্মান নারীদের প্রধান কর্তব্য কি ছিল ? জার্মান উপজাতিদের প্রধান পেশা কি ছিল ?

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

১। ইউরোপের ইতিহাসে কোন্ সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয় ? ইহার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২। কেন ইউরোপের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ'কে অন্ধকার বলা যায় না ? যুক্তি দিয়া প্রমাণ কর। ৩। 'অন্ধকার যুগে' সাধুসন্তদের অবদান সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :—১। পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতনের ফলে অর্থনৈতিক জীবন কিভাবে বিপর্যস্ত হয় ? ২। সেণ্ট বেনেডিক্টের আদর্শ ও নীতি কি ছিল ? কোথায় ছিল তাঁহার বিখ্যাত মঠ ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—১। ——হইতে——খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তকাল ইউরোপের ইতিহাসে——যুগ। ২। ইউরোপে অন্ধকার যুগে——ভাষা প্রসার লাভ করে। ৩। ——ও——ছিল অন্ধকার যুগে বিদ্যার্চ্চার কেন্দ্রস্থল। ৪। ——বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'সিটি অফ গড'।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

১। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কর। কে ও কখন ইহার প্রতিষ্ঠা করেন? ইহার গুরুত্ব নির্দেশ কর।

২। কোন্ সম্রাট খ্রীষ্টধর্মকে প্রথম স্বীকৃতি দান করেন এবং কি কারণে?

৩। জাষ্টিনিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও। তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছিল? ৪। জাষ্টিনিয়ানের আইনবিধি সম্বন্ধে কি জান?

৫। বাইজেণ্টাইন শিল্প ও স্থাপত্যের পরিচয় দাও। কেন এই সভ্যতার নিকট পশ্চিম জগৎ ঋণী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—১। কেন কন্‌স্টান্টিনোপল দীর্ঘকাল বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হয়? ২। কেন ও কিভাবে রোমান সম্রাটগণ খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করিতেন? ৩। কেন জাষ্টিনিয়ান জার্মান জাতিদের ঘৃণা করিতেন? ৪। জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্বন্ধে কি জান?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—১। কোন্ সালে ও কাহাদের আক্রমণে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়? ২। কোন্ সম্রাটের নামানুসারে কন্‌স্টান্টিনোপলের নামকরণ হয়? ৩। জাষ্টিনিয়ানের বিখ্যাত সেনাপতির নাম কি? ৪। সাণ্টা সোফিয়া গীর্জার দুই স্থপতির নাম কি? ৫। বাইজেণ্টাইন সভ্যতায় কোন তিনটি সভ্যতার প্রভাব দেখা যায়?

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

১। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন কে করেন? তিনি তাঁহার শিষ্যদের কি কি উপদেশ দিতেন? কোন্ সময় হইতে হিজরী সন গণনা করা হয়?

২। খলিফা কাহাদের বলা হইত? "সাধু খলিফাদের" সম্বন্ধে কি জান?

৩। কিভাবে মহরম ও শিয়া এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়?

৪। আরবদের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? কোন্ রাজবংশের রাজত্বকালে আরবদের সবচেয়ে বেশী উন্নতি হইয়াছিল? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?

৫। আরবদের সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান? কয়েকজন বিখ্যাত মুসলমান মনীষীর নাম কর। ইউরোপের অধিবাসীরা আরবদের কাছে কি ভাবে ঋণী?

৬। কর্ডোভা রাজ্যের কথা যাহা জান বল।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—১। হজরত মহম্মদের মূল ধর্মমত কি ছিল? ২। কোরাণে বর্ণিত মুসলমানদের পাঁচটি অবশ্য পালনীয় বিধি ব্যাখ্যা কর। ৩। হারুণ-অল-রসিদ কে ছিলেন। তিনি কিসের জন্য বিখ্যাত?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—১। ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক কে? আরববাসীদের প্রধান ধর্মকেন্দ্র কি? ২। মহম্মদের চারজন প্রিয় শিষ্যের নাম কর। ৩। কে কাহাদের বঞ্চিত করিয়া ওম্মায়েদ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন? ৪। শিয়া ও সুন্নী কাহাদের বলে? ৫। আরবদের কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের নাম কর।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

১। শার্লমেন কে ছিলেন? কি কি কারণে তাঁহার অভিষেক হয়?
২। শার্লমেন কর্তৃক পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পুনরুত্থানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩। শার্লমেনের রাজত্বকালে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের জীবনধারা কিরূপ ছিল? সভ্যতায় মঠের অবদান কি?
৫। চার্চের অনাচার দূরীকরণে বিভিন্ন শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের প্রচেষ্টার বিবরণ দাও।
৬। পোপ-সম্রাট সংঘর্ষের কারণ কি?
৭। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উত্থানের কারণ কি?
৮। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিকাশ কিরূপে হইয়াছিল? সেযুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—১। চার্লস দি গ্রেট কিভাবে রাজ্যশাসন করিতেন? ২। তৎকালীন ভাবমানস কিভাবে পশ্চিম সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানে সহায়তা করে? ৩। রোমের পোপগণের সহিত পূর্ব রোম-সম্রাটদের সম্পর্ক ভাল ছিল না কেন? ৪। অ্যাঙ্কোরাইট ও সেনোবাইটদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ৫। মধ্যযুগে কেন শিক্ষক ও ছাত্রগণ গীল্ড গঠন করিত?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—১। ——শার্লমেনের জীবন চরিত রচনা করিয়াছেন। ২। খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় লিও——অভিষিক্ত করেন। ৩। ফ্রানসিস্‌কান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন——। ৪। ডমিনিকানদের মধ্য হইতে বিখ্যাত সাহিত্যিক——আবির্ভূত হন। ৫। বোলোগ্‌না বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত——নাম ও——বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পিটার আবেলার্ডের নাম যুক্ত হইয়া আছে।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

১। সামন্তপ্রথা কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
২। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কারণ কি কি?
৩। লর্ড ও ভ্যাসাল্ কাহাদের বলে? ভ্যাসাল্‌গণ লর্ডদের কি কি কর দিত?
৪। মধ্যযুগের দুর্গ ও প্রাসাদ এবং নোব্‌লদের জীবনধারার বর্ণনা দাও।
৫। শিভাল্‌রী বা বীরপ্রথার উপর একটি প্রবন্ধ লিখ।
৬। সামন্তপ্রথার দোষগুণ আলোচনা কর।
৭। ম্যানোরীয় প্রথা কাহাকে বলে? ইহার উৎস কি?
৮। মধ্যযুগে কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা কর।

৯। ম্যানর হাউস কাহাকে বলে? ম্যানর-আদালত কোথায় বসিত এবং ইহাদের কি কাজ ছিল?

১০। সার্ফরা জমিদারদের বিরুদ্ধে কেন বিদ্রোহ করিত? কিভাবে ইহারা মুক্তির উপায় সন্ধান করে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নঃ—১। লর্ডের ভ্যাসালের প্রতি কি দায়িত্ব ছিল? ২। সামন্তপ্রথাকে কেন 'ব্যক্তিভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা' বলা হয়? ৩। সামন্তদের দুর্গে কি ধরনের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল? ৪। সার্ফরা লর্ডদের কি কি কর দিত? ৫। খামারে কিভাবে জমি চাষ হইত?

বিষয়মুখী প্রশ্নঃ—১। ভ্যাসালগণ সমাজে কোন্ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন? ২। সামন্ততন্ত্রের মধ্যে কি কি গণতান্ত্রিক নীতি ছিল? ৩। ট্রুবাডুর কাহাদের বলে? ৪। একটি সাধারণ খামারে কত একর চাষের উপযোগী জমি থাকিত? ৫। কেন সার্ফরা শহরে পলায়ন করিত?

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

১। ক্রুসেডের পিছনে কি কি শক্তির প্রতিক্রিয়া ছিল?

২। ক্রুসেডের অভিযানগুলির বিবরণ দাও।

৩। ক্রুসেডের ফলাফল আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নঃ—১। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন কিভাবে ধর্মযুদ্ধে প্রেরণা দেয়। ২। আদর্শগত প্রেরণা কতখানি ধর্মযুদ্ধের জন্য দায়ী? ৩। নর্মানদের কার্যকলাপ কিভাবে ধর্মযুদ্ধে উৎসাহের সঞ্চার করে? ৪। ধর্মযুদ্ধে রোমান পোপের কি উদ্দেশ্য ছিল? কিভাবে ইহা পোপের শক্তি বৃদ্ধি করে?

শূন্যস্থান পূরণ করঃ—১। ——শব্দ হইতে ক্রুসেড কথাটি আসিয়াছে। ২। ——জেরুসালেম অধিকার করিলে——তীর্থযাত্রা বিঘ্নিত হয়। ৩। পোপ——খ্রীষ্টাব্দে——ধর্মসভায় ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৪। ধর্মযুদ্ধের ফলে——শ্রেণী দুর্বল হইয়া পড়ে। ৫। ক্রুসেডের ফলে——সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত——পরিচয় ঘটে।

॥ নবম অধ্যায় ॥

১। কি কি কারণে মধ্যযুগে ইউরোপের শহরগুলির উদয় হয়?

২। গীল্ড কাহাকে বলে? ইহার কি উদ্দেশ্য ছিল?

৩। মধ্যযুগে শহরের জীবনযাত্রার বর্ণনা দাও। সভ্যতায় শহরগুলির অবদান কি?

বিষয়মুখী প্রশ্নঃ—১। 'বার্জেস' কাহাদের বলে? ২। মধ্যযুগীয় সভ্যতার তিনটি প্রাণকেন্দ্র কি কি? ৩। মধ্যযুগের শহরগুলি কোন্ শ্রেণীর জন্ম দেয়? ৪। ফ্লোরেন্স কি জন্য বিখ্যাত ছিল?

॥ দশম অধ্যায় ॥

১। কোন্ রাজার রাজত্বকাল ছিল তাং বংশের গৌরবময় যুগ।

২। কোন্ সময়ে চীনে চা-পানের প্রচলন হয়?

৩। তাং-শাসিত চীনে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে লিখ। এই প্রসঙ্গে হিউয়েন সাঙের ভূমিকা কি ছিল? ৪। তাং যুগে চীনা পাণ্ডিত্যের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৫। তাং-শাসিত চীনে চিত্রশিল্প ও মুদ্রণ সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৬। তাং আমলে চীন প্রতিবেশীদের কিরূপ প্রভাবিত করে?

৭। সুং যুগে চৈনিক সংস্কৃতির একটি বর্ণনা লিখ।

৮। ওয়াং আন্-শির কর্মসূচী ও ইহার পরিণতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

৯। কুবলাই খাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১০। পোলোদের চীনে আগমন ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ। ১১। মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে কি জান?

১২। জাপানী সম্রাটের দ্বৈত ভূমিকার উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

১৩। নারা ও হিয়ান যুগে জাপানের ধর্মীয় অবস্থা আলোচনা কর।

১৪। নারা ও হিয়ান্ যুগে জাপানী সংস্কৃতির একটি বিবরণ লিখ।

১৫। জাপানে কিভাবে সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণীর 'শাসনের উদ্ভব হয়?

১৬। কুজে, বুকে, দাইমিয়ো, সামুরাই, শোগুন, বাকুফু, বুশিদো এই শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যা কর।

১৭। কামাকুরা ও আশিকাগা আমলে জাপানী সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

১৮। জাপানে কিভাবে হেজো প্রভুত্বের অবসান ঘটে?

১৯। আশিকাগা হইতে তোকুগাওয়া রাজত্ব পর্যন্ত জাপানী রাজনীতির একটি চিত্র তুলিয়া ধর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—১। তাং সাম্রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান? ২। হিউয়েন সাঙ্ কে? তিনি কোন্ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন? ৩। তাং যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁহাদের কাব্যের রূপ বর্ণনা কর। ৪। নারা যুগে জাপানী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চিত্র অঙ্কন কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—১। তাং বংশের প্রকৃত স্রষ্টা কে এবং তিনি কাহার সমসাময়িক? ২। কাহার রাজত্বকালে তাং বংশের গৌরব চরম শিখরে আরোহণ করে? ৩। হান্ ইউ কে ছিলেন? ৪। কুব্লাই খাঁর সৃষ্ট নূতন নগরীর নাম কি? ৫। কাহারা সামুরাই নামে পরিচিত? ৬। ইকেবেনা কি?

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

১। ভারতে হূণ আক্রমণ ও উহার তাৎপর্য আলোচনা কর।

২। কিভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে ?

৩। হর্ষবর্ধনের উত্থান ও তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লিখ।

৪। হিউয়েন সাঙ্ ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে কি লিখিয়াছেন ?

৫। সি-ইউ-কি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি আলোকপাত করিয়াছে ?

৬। নবম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত হর্ষোত্তর কনৌজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর।

৭। 'ত্রিশক্তি' সংগ্রামের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিখ।

৮। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান ? প্রধান রাজপুত গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত কর।

৯। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজপুতদের সাম্রাজ্যবাদী ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কিভাব ব্যর্থ হয় ? ১০। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের গুরুত্ব নির্ণয় কর।

১১। পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান ?

১২। পাল আমলে বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

১৩। পাল ও সেন পর্বে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর।

১৪। বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী ও সোনপুর মহাবিহার সম্বন্ধে টীকা লিখ।

১৫। পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্যের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

১৬। বাংলার ইতিহাসে পাল ও সেন যুগের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১৭। চালুক্য শক্তির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার লিখ।

১৮। পল্লব শক্তির রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিবরণী দাও। শিল্প ও স্থাপত্যে তাহাদের কি অবদান ছিল ?

১৯। চোলদের সামুদ্রিক দিগ্বিজয় সম্বন্ধে একটি টীকা লিখ।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—১। হূনরাজ — পুত্র — রাজধানী ছিল শাকলে। ২। ধর্মপাল কনৌজের রাজা — পরাজিত করিয়া — সিংহাসনে বসান। ৩। — আমলে ভারতে চন্দেল্ল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪। পালযুগের দুইটি বিখ্যাত মহাবিদ্যালয় ছইল — এবং — মহাবিহার। ৫। বল্লাল সেনের দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ — ও — এখনও বিদ্যমান।

নিম্নোক্তদের মধ্যে কোন্‌টি শুদ্ধ তাহা চিহ্নিত কর ঃ—

১। রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা ছিলেন—প্রভাকরবর্ধন, রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন।

২। হর্ষের সভাকবি ছিলেন—কালিদাস; বানভট্ট, হিউয়েন সাঙ্।

৩। হর্ষের আমলে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—কর্ডোভা, বিক্রমশীল, নালন্দা।

৪। বুন্দেলখণ্ডের বিখ্যাত বংশের নাম—গুহিলা, চন্দেল্ল, কলচুরী।

৫। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন—লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেন, হলায়ুধ।

৬। চৌহান বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন—মূলরাজ, ভোজ, তৃতীয় পৃথ্বীরাজ।

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

১। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্য ও পূর্ব এশিয়া এবং তিব্বতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল? ২। কোন্ অঞ্চলে 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত ছিল এবং কেন?

৩। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৪। মজপহিত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৫। কম্বুজ সাম্রাজ্যের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে এবং চম্পায় ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে প্রসারিত হয়?

এক কথায় উত্তর লিখ ঃ

১। কোন্ ভারতীয় বৌদ্ধ দার্শনিক তিব্বতে ধর্মপ্রচার করেন?

২। অশোকের ধর্মপ্রচারকগণ সিংহলে কোন্ রাজার আমলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে?

৩। কোন্ বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত শৈলেন্দ্র রাজগণের ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন?

৪। শৈলেন্দ্র রাজগণের শিল্পানুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি?

৫। কাহাদের আক্রমণে চম্পা রাজ্য ধ্বংস হয়?

৬। কম্বুজ রাজ্যের শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি?

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

১। কি কারণে ও কিভাবে ভারতে তুর্ক-আফগান শক্তির অভ্যুদয় হয়?

২। তুর্ক-আফগান যুগে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ও শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

৩। সুলতানী আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি চিত্র তুলিয়া ধর।

৪। ভক্তি আন্দোলনের মূল বক্তব্য এবং এই আন্দোলনে কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। উদারনৈতিক সমন্বয়ী ভাবধারা সুলতানী যুগের সংস্কৃতিতে কিরূপে প্রতিফলিত হয়?

৬। ইলিয়াশ শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কাহার আক্রমণে তুঘলক সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয় ?

২। 'সকল ধর্মই এক'—এই মতবাদের প্রচারক কে ?

৩। চৈতন্যদেবের মুসলমান শিষ্য কে ছিলেন ?

৪। শিখধর্মের প্রবর্তক কে এবং কোন্ গ্রন্থে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে ?

৫। কথক ও গজল কি ?

৬। ভারত মুসলমানদের নিকট হইতে কি চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে ?

৭। মালাধর বসু কে এবং কিজন্য বিখ্যাত ?

॥ চতুর্দশ অধ্যায় ॥

১। রেনেসাঁস কাহাকে বলে ? কিভাবে পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁসের সূচনা হয় এবং কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন কিভাবে তাহাকে প্রভাবিত করে ?

২। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কিভাবে পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নূতন ভাবধারার সংঘাত দেখা দেয় ? তাহার ফল কি হইয়াছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য কোন্ সংস্কৃতির ধারক ছিল ?

২। ইটালীর কয়েকজন মনীষীর নাম কর যাঁহারা ছিলেন নবজাগরণের অগ্রদূত।

৩। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে কোন্ রাজবংশের নেতৃত্বে জাতীয় রাষ্ট্রের উদয় হয় ?

৪। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কোন্ মনীষীদের অবদান উল্লেখ্য ?

———

Price : Rs. 11.00